আর্য জ্যোতি

বাংলাদেশ অগ্নিবীর দ্বারা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা, জুলাই - ডিসেম্বর

২০৮০ বিক্রমাব্দ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (শ্রাবণ - অগ্রহায়ণ)

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আর্যসমাজের অবদান

১৯৭১ সালের জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩ লাখেরও বেশী। এসময় আর্যসমাজের দিল্লি সভা থেকে শ্রী ওম্ প্রকাশ ত্যাগী কলকাতায় আসেন শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য। হাজার হাজার অনাথ শিশুরা শরণার্থী হিসেবে শিবিরে ছিলো। অনাথদের প্রতি অন্য মতাবলম্বী বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতাও ছিলো। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে শ্রী ত্যাগীর পরামর্শে আর্যসমাজ কলকাতায় রিলিফ সোসাইটি গঠন করা হয়। তাতে সভাসদ ছিলেন -

প্রধান - শ্রী বারাণসী দাস অরোড়া [প্রধান, আর্যসমাজ কলকাতা]

মন্ত্রী - শ্রী মোহনলাল আগরওয়াল [উপমন্ত্রী, আর্যপ্রতিনিধি সভা বাংলা]

সহমন্ত্রী - শ্রী সত্যানন্দ আর্য [কলকাতা কোষাধ্যক্ষ]

কোষাধ্যক্ষ - শ্রী সত্যনারায়ণ আগরওয়াল [হাওড়া]

এছাড়াও শ্রী গজানন্দ, শ্রী রাম জসওয়াল, শ্রী রুলিয়ারাম গুপ্ত, শ্রী ছবীলদাস সৈনী, শ্রী বটুকৃষ্ণ বর্মন, শ্রী পূর্ণচন্দ্রসহ অনেকে মিলে একটি উত্তম টীম গঠিত হলো।

সার্বদেশিক সভা প্রায় ৩০০০ হাজার বস্ত্র সহায়তা হিসেবে দ্রুত প্রেরণ করে। আর্যসমাজ ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ এখানে সম্মিলিত কাজ করেছিলো। সরকারীভাবে তো সাহায্য চলছিলোই পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের চাপও বাড়ছিলো । ভোরুকা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ১৩০০ কম্বলের ব্যবস্থা করে এবং শ্রী প্রভুদয়াল আগরওয়াল যিনি কিনা তৎকালীন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াতে ছিলেন তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহে সমগ্র কাজে যান্ত্রিক ও যানবাহনগত সহায়তা প্রদান করেন৷ একই কোম্পানির শ্রী ব্রহ্মানন্দ গোয়েল ব্যক্তিগতভাবে ট্রাস্টের মাধ্যমে ১৬০টি কম্বল প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সব থেকে বেশী পীড়িত ধর্মীয় কারণে সনাতনীরাই হয়েছিলো। শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ার কারণে দ্বিতীয়ধাপে পণ্ডিত বাচস্পতি শাস্ত্রীকে পাঠানো হয় সরেজমিনে অবস্থা দেখতে । তিনি ব্রহ্মচারী চেতনানন্দের সহায়তায় ক্যাম্প গিয়ে স্থানীয় প্রতিটি পরিবারের খোঁজ নেন। কৃষ্ণনগরের নিকটে শিমুলতলা আমবাগানে ৫৮টি ক্যাম্পে ৩২৫টি শরণার্থী পরিবার ছিলো। রিলিফ সোসাইটির মন্ত্রী শ্রী মোহনলাল আগরওয়াল এখানে সাহায্যের উদ্বোধন শ্রী পণ্ডিত বাচস্পতি শাস্ত্রীর মাধ্যমেই করান । এই ক্যাম্পে ৩৫০টি কম্বল সব পরিবারে ও ১৫০টি গরমবস্ত্র শিশুদের দেওয়া হয় ।

সল্টলেকে ৫০০ চাদর ও ১৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। পূর্বোক্ত শ্রী প্রভুদয়াল স্বয়ং এই বিতরণ করেছিলেন । শরণার্থীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিলো তাদের জন্য আহার্যের পাশাপাশি পুস্তক বিরতণ ও এমনকি যজ্ঞোপবীত সংস্কারও হয়েছিলো যারা ইচ্ছুক ছিলো তাদের মধ্যে । পণ্ডিত বাচস্পতি শাস্ত্রী স্বয়ং এই সংস্কারের ঋত্বিক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত ছিলো।

সন্দর্ভঃ

১। আর্যসমাজ কলকাতার শতবর্ষীয় ইতিহাস - প্রফেস উমাকান্ত উপাধ্যায়
২। আর্যসমাজের ইতিহাস - ড. সত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার ও প্রফেসর হরিদত্ত বেদালঙ্কার

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ
শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ সমন্বয়ক, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

প্রকাশক: স্বাধ্যায় প্রকাশনী

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

প্রচ্ছদ / pdf নির্মাণে : জনি দেব

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

Bangladesh Agniveer

সূচিপত্র

১) এক ঝলকে সম্পূর্ণ বৈদিক বাঙ্ময় ---------- ৫
২) [হুদুর দুর্গা প্রসঙ্গ] অসুরপূজা নিয়ে ঘোর বিতর্ক; দুর্গা-মহিষ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কী কী বলে আবহমান সংস্কৃতি ? ---- ৮
৩) বেদে ভক্তি কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ? ---------- ১৪
৪) ভূমিকম্প সম্পর্কে বেদে কী বলা হয়েছে ---------- ১৯
৫) এতো বিভক্ত সনাতনী সমাজ ঐক্য আনতে বেদের গুরুত্ব কী? ---------- ২১
৬) মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান কেন? ---------- ২৪
৭) মহর্ষি দয়ানন্দের দেহত্যাগে এক ভক্তের সংস্কৃতে হাহাকার প্রকাশ ---------- ২৭
৮) কেন আমি মহর্ষি দয়ানন্দের শিক্ষাকে অনুসরণ করবো? ---------- ৩১
৯) হিন্দুধর্ম নিয়ে পাদ্রীকে মোক্ষম জবাব দিলেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ---------- ৩৩
১০) পশুবলি বিষয়ে শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসককে নিয়ে নাস্তিক - পৌরাণিকদের মিথ্যাচার খণ্ডন---------- ৩৫
১১) ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখায় কি কালিয় নাগ ও শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে ? ---------- ৩৮
১২) আধিভৌতিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ ---------- ৪২
১৩) সামবেদ কি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট? ---------- ৪৭
১৪) প্রকৃত যোগীর লক্ষণ কী? ---------- ৫০
১৫) যজ্ঞোপবীতের মহত্ত্ব ---------- ৫২
১৬) সত্যার্থ প্রকাশ ও মহর্ষি দয়ানন্দ সম্পর্কে যা বলেছিলেন ভারতের ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন মোরারজী দেসাই - ৫৭
১৭) মহর্ষি দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ নিয়ে যা বললেন পূর্ব রাজ্যমন্ত্রী শের সিংহ ---------- ৫৭
১৮) প্রেমের বিয়ে কী গান্ধর্ব বিবাহ এটি কী ধর্মীয় দৃষ্টিতে বৈধ ---------- ৫৮
১৯) আর্যসমাজের ১০ নিয়মের ব্যাখ্যা ---------- ৬০
২০) আর্য সমাজ কর্তৃক খ্রিষ্ট-মত খণ্ডন বাঙ্‌ময় ---------- ৬৬
২১) কালিকা পুরাণে নরবলি কি অপরাধীদেরই দেওয়া হতো ? মিথ্যাচারের খণ্ডন ---------- ৭৫
২২) কালিকাপুরাণে বলি - গোরু থেকে মানুষ কী নেই সেখানে জানুন ---------- ৭৮
২৩) নোয়াখালী-কোলকাতা দাঙ্গায় আর্যসমাজের ভূমিকা ---------- ৯২
২৪) শাক্তরা কিভাবে দয়ানন্দজীর বলি দিতে ষড়যন্ত্র করেছিলো ? ---------- ৯৪
২৫) মহাপুরুষদের বা পূর্বপুরুষদের ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে মহর্ষি দয়ানন্দের সিদ্ধান্ত কি ছিলো ---------- ৯৮
২৬) শাস্ত্রার্থ আয়োজনের সর্বমান্য নিয়ম তথা শাস্ত্রার্থ কলাকৌশলে নিপুণ হওয়ার বীজমন্ত্রসমূহ ---------- ৯৯
২৭) মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর গোরক্ষা বিষয়ে প্রবচন ---------- ১০৫
২৮) মহর্ষি দয়ানন্দের গোরক্ষা উদ্যোগ - গোরক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম ---------- ১০৯
২৯) সনাতন ধর্মে কি সুদ গ্রহণ বা প্রদান করা নিষিদ্ধ? ---------- ১১৪
৩০) গোরক্ষা আন্দোলন ও মহর্ষি দয়ানন্দ রচিত পুস্তক ‘ গোকরুণানিধিঃ ’ ---------- ১১৬
৩১) বেদপাঠের পূর্বে পালনীয় নিয়ম ---------- ১২৩
৩২) কেন আমি বেদকে ভালোবাসি ? ---------- ১২৫
৩৩) সামবেদ কি ঋগ্বেদেরই অংশ বা সংকলন ? ---------- ১৩৫
৩৪) বেদে “ হরি ” মাহাত্ম্য ---------- ১৩৮
৩৫) গুরু যদি পাপ করে শিষ্যদের কী করণীয় ? ---------- ১৪২
৩৬) বিবাহ কত ধরনের হয় ? শাস্ত্রে ৮ ধরনের বিয়ের কথা আছে তা কী কী ? ---------- ১৪৬
৩৭) গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক করুণানিধি শ্রীমৎ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ---------- ১৫০
৩৮) বেদে আত্মরক্ষা ও প্রত্যাঘাতের আদেশ ----------১৫৪

এক ঝলকে সম্পূর্ণ বৈদিক বাঙ্ময়

ঋগ্বেদ

শাখাঃ শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন
ব্রাহ্মণঃ ঐতরেয়, কৌষিতকি (শাঙ্খায়ন)
আরণ্যকঃ ঐতরেয়, শাঙ্খায়ন
উপনিষদঃ ঐতরেয়, কৌষিতকী

কল্পসূত্রঃ

(১) গৃহ্যসূত্রঃ আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন, কৌষিতকী (শাম্বব্য)
(২) শ্রৌতসূত্রঃ আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন
(৩) ধর্মসূত্রঃ বসিষ্ঠ

যজুর্বেদ

শাখাঃ মাধ্যন্দিন , কাণ্ব
ব্রাহ্মণঃ শতপথ ব্রাহ্মণ
আরণ্যকঃ বৃহদারণ্যক
উপনিষদঃ ঈশোপনিষদ্ , বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

কল্পসূত্রঃ

(১) গৃহ্যসূত্রঃ পারস্কর
(২) শ্রৌতসূত্রঃ কাত্যায়ন
(৩) ধর্মসূত্রঃ শঙ্খ, লিখিত
(৪) শুল্বসূত্রঃ বৌধায়ন, মানব,আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, মৈত্রায়ণীয়, হিরণ্যকেশি(সত্যাষাঢ়), বারাহ

সামবেদ

শাখাঃ কৌথুম, রাণায়নীয়, জৈমিনীয়
ব্রাহ্মণঃ কৌথুমীয় - তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ়), ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ (অদ্ভুত ব্রাহ্মণ), মন্ত্র, দেবতাধ্যায়, বংশ, সংহিতোপনিষদ্, সামবিধান, আর্ষেয় ; জৈমিনীয় - জৈমিনীয়, জৈমিনীয় আর্ষেয়, জৈমিনীয় উপনিষদ্
আরণ্যকঃ
উপনিষদঃ কেনোপনিষদ্, ছান্দোগ্যোপনিষদ্

কল্পসূত্রঃ

(১) গৃহ্যসূত্রঃ গোভিল, কৌথুম, খাদির, দ্রাহ্যায়ণ, জৈমিনীয়
(২) শ্রৌতসূত্রঃ আর্ষেয় (বা মশক), ক্ষুদ্র, জৈমিনীয়,লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ, নিদান, উপনিদান
(৩) ধর্মসূত্রঃ গৌতম

অথর্ববেদ

শাখাঃ শৌনক, পৈপ্পলাদ
ব্রাহ্মণঃ গোপথ
আরণ্যকঃ
উপনিষদঃ মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, মুণ্ডকোপনিষদ্, প্রশ্নোপনিষদ্

কল্পসূত্রঃ

(১) গৃহ্যসূত্রঃ কৌশিক
(২) শ্রৌতসূত্রঃ বৈতান
(৩) ধর্মসূত্রঃ পঠিনাসী

তৈত্তিরীয় শাখা

শাখাঃ তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণীয়, কঠ(কাঠক), কপিষ্ঠল - কঠ
ব্রাহ্মণঃ তৈত্তিরীয়
আরণ্যকঃ তৈত্তিরীয়
উপনিষদঃ তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়ণী

কল্পসূত্রঃ

(১) গৃহ্যসূত্রঃ বৌধায়ন, মানব, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, কাঠক, আগ্নিবেশ্য, হিরণ্যকেশি, বারাহ, বৈখানস, চারায়ণীয়, বৈজবাপ
(২) শ্রৌতসূত্রঃ বৌধায়ন, বাধুল, মানব, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, কাঠক, সত্যাষাঢ়, বারাহ, বৈখানস
(৩) ধর্মসূত্রঃ মানব, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি, বৈখানস
(৪) শুল্বসূত্রঃ যজুর্বেদ-বৎ

বেদাঙ্গ

১। শিক্ষা - ঋগ্বেদীয় পাণিনীয় শিক্ষা, সামবেদীয় নারদীয় শিক্ষা, যজুর্বেদীয় যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, অথর্ববেদীয় মাণ্ডুকী শিক্ষা [প্রাতিশাখ্য - ঋগ্বেদীয় শাকল প্রাতিশাখ্য ; সামবেদীয় সামপ্রাতিশাখ্য, পুষ্পসূত্র, পঞ্চবিধসূত্র, ঋকতন্ত্র ব্যাকরণ ; যজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ; তৈত্তিরীয় শাখা তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ; অথর্ববেদীয় অথর্ববেদ ও শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য]

২। ব্যাকরণ -পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জল মহাভাষ্য
৩। নিরুক্ত - যাস্কীয় নিরুক্ত ও নিঘণ্টু
৪। কল্প - পূর্ব বর্ণিত
৫। জ্যোতিষ - লগধীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ [যজুর্বেদীয়]
৬। ছন্দ - পিঙ্গলরচিত ছন্দসূত্র

ঋগ্বেদের ২১টি, যজুর্বেদের ১০০টি, সামবেদের ১০০০টি ও অথর্ববেদের ৯টি শাখা ছিলো । আরো পড়ুন -

১. ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রাজা ও আচার্যদের ইতিহাস - https://www.agniveerbangla.org/2021/12/blog-post_3.html

২. হারিয়ে যাওয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থ - https://www.agniveerbangla.org/2021/12/blog-post_30.html

বেদার্থ প্রক্রিয়া , বেদভাষ্য শৈলী ও অন্যান্য

১.যাজ্ঞিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ
https://back2thevedas.blogspot.com/2023/03/blog-post_23.html?m=1
২. বেদার্থ এবং নিরুক্ত শাস্ত্র
https://back2thevedas.blogspot.com/2022/11/blog-post.html?m=1

৩.ঐতিহাসিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ
https://back2thevedas.blogspot.com/2022/10/blog-post_20.html?m=1

৪.ভাষাবিজ্ঞান- প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/10/blog-post_12.html?m=1

৫.আধিদৈবিক- প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/10/blog-post.html?m=1

৬. আধ্যাত্মিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/08/blog-post_30.html?m=1

৭. মন্ত্র-পুনরুক্তি মীমাংসা

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/08/blog-post.html?m=1

৮. নিরুক্ত এবং দেবতাবাদ

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?m=1

৯. বেদার্থের ত্রিবিধ তথা চতুর্বিধ প্রক্রিয়া

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/05/blog-post_21.html?m=1

১০. বেদ মন্ত্রের বিনিয়োগ

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/05/blog-post_6.html?m=1

১১. বেদ এবং ঋষি-মুনিগণের পরম্পরা

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/05/blog-post.html?m=1

১২. চরণ এবং শাখা

https://back2thevedas.blogspot.com/2021/12/blog-post_43.html?m=1

১৩. শ্রুতি সংজ্ঞা বিচার

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/05/blog-post_3.html?m=1

[হুদুর দুর্গা প্রসঙ্গ] অসুরপূজা নিয়ে ঘোর বিতর্ক; দুর্গা-মহিষ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কী কী বলে আবহমান সংস্কৃতি ?

২০১১ সালের ৫ অক্টোবর, পুরুলিয়ার গ্রাম্য অঞ্চলে একদল যুবক প্রথম শুরু করলেন মহিষাসুর-পূজা। তাঁদের প্রচারে, সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তীর নায়ক 'হুদুড়-দুর্গা' একীভূত হলেন মহিষাসুরের সঙ্গে, বলা হল- আর্য আগ্রাসনের সময় তাঁদের প্রেরিত ছলনাময়ী দেহোপজীবিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন এই হুদুড়-দুর্গা। খুব তাড়াতাড়ি, সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে দুর্গোৎসবের এই Counter Culture ছড়িয়ে পড়ল দেশ জুড়ে। এই কার্যক্রমের সঙ্গে তাল মেলালেন সুষমা অসুর, যিনি 'অসুর' উপজাতির প্রতিনিধি। এই অসুর-ইস্যুটিকে কিছুদিন আগেই, মহালয়াতে, বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কবীর সুমন মহাশয় সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার বীর, আমি তোমার অনুগত।' তাঁর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই নেটিজেন দুনিয়াতে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাই, এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের অবতারণা।

কিন্তু কী ছিল, অসুর-পূজায় এই উদ্যোগের কারণ? আয়নানগর পত্রিকায় ২০১৭ সালের ২০ মে প্রকাশ পেল খেরোয়াল গোষ্ঠীভুক্ত সাঁওতাল বুদ্ধিজীবী অজিত প্রসাদ হেমব্রমের একটি সাক্ষাৎকার, যিনি ছিলেন এই অনুষ্ঠানের এক মূল উদ্যোক্তা। সেই সাক্ষাতকার খুঁটিয়ে পড়লেই জানা যাবে, অসুর-পূজার এই কার্যক্রমের প্রকৃত রহস্যের ইতিবৃত্ত।

হেমব্রম দাবি করেছেন, অসুর-পূজা প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল গোষ্ঠীর বীর নায়ক 'হুদুড়-দুর্গা'র স্মরণে শহীদ দিবস। তিনি সিধু, কানু, বীরসা মুণ্ডার সঙ্গে এক পংক্তিতে রাখতে চান হুদুড়-দুর্গাকে। কিন্তু, হুদুড় এক কিংবদন্তীর চরিত্র মাত্র, তাঁর ঐতিহাসিকতার কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই। তাই সিধু-কানু-বীরসার সঙ্গে এক পংক্তিতে তাঁকে রাখা কতখানি যুক্তিযুক্ত, সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়া 'সাঁওতাল' আর 'অসুর' দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী। এক গোষ্ঠীর মিথ অন্য গোষ্ঠীর মিথের সঙ্গে অবাধে মিশিয়ে ফেলা কতখানি গ্রহণযোগ্য, প্রশ্ন ওঠে সেখানেও। আসুন, এবার হেমব্রমের বলা কাহিনীটি নিয়ে একটু আলোচনা করি।

হেমব্রম বলেছেন, হুদুড়-দুর্গার বাসস্থান ছিল 'চাইচম্পা' নামক এক স্থানে। সেখানেই তিনি তাঁর খলস্বভাবা আর্যপত্নীর হাতে নিহত হন। "Whichever form this story may be narrated, the marriage is always mentioned in it."- বলেছেন হেমব্রম। অথচ, বহু শতাব্দী ধরে মহিষাসুরের বাসভূমি এবং দুর্গার হাতে তাঁর নিহত হবার স্থান হিসাবে খ্যাত যে নগরটি, তা হল কর্ণাটকের মহীশূর। সেখানে, অসুররাজের বধ্যভূমিতে রয়েছে মহিষাসুর-হন্ত্রী দেবী 'চামুণ্ডেশ্বরী'-র মন্দির। 'চাইচম্পা'-র কোনও উল্লেখ সেখানকার কোনও কাহিনীতে আছে বলে জানা যায় না। মহিষাসুরের বিধবা পত্নী হরিহরপুত্র আয়াপ্পানের হাতে নিহত হয়েছিলেন, এই মিথ কেরালায় প্রচলিত বহু শতক ধরে। অর্থাৎ মহিষাসুর ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বাসভূমি দক্ষিণভারতে থাকার ইঙ্গিতই মিলছে, পূর্ব ভারতে কদাচ নয়।

আর, দুর্গা ও অসুরের বিবাহ? বামনপুরাণে দেখা যাচ্ছে, দেবী দুর্গার রূপে কামোন্মত্ত মহিষাসুর দেবীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপ্রয়োগে তাঁকে অধিকার করতে এসে সসৈন্যে নিহত হয়। অন্যান্য পুরাণে ও উপপুরাণেও কাহিনীটি এরকমই- কোথাও দুর্গা ও মহিষের বিবাহের কোনও প্রসঙ্গ নেই। আরও স্মর্তব্য, মহিষ-বধের প্রতিটি কাহিনীতে দেবীর বাহন সিংহের উপস্থিতি রয়েছে, কিন্তু সাঁওতাল-গোষ্ঠীর আদি নিবাস ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল কখনওই সিংহের প্রাকৃতিক বাসভূমি ছিল না। এবং, তথাকথিত শহীদ-পুরুষ 'হুদুড় দুর্গা' নামের মধ্যে 'দুর্গা' শব্দটি আছে, অথচ 'দুর্গা' শব্দটি সংস্কৃত-সহ অজস্র আর্যভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ তথা নারীনাম রূপেই পরিগণিত।

হেমব্রম আরও জানিয়েছেন, "Those days our ancestors did not fight women." আর তাদের এই নীতিবোধকে দুর্বলতা হিসাবে কাজে লাগিয়েই নাকি, আর্যরা তার কাছে পাঠালো প্রচ্ছন্ন-ঘাতক এক সুন্দরীকে। অথচ, পৌরাণিক অসুরবধের প্রতিটি কাহিনীতে, দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুর ও তার সেনাবাহিনীর বিপুল সংগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শিব পুরাণ, বামন পুরাণ- সর্বত্র রয়েছে এই যুদ্ধকথা। তাহলে, কী করে এক হতে পারে দুটো কাহিনী?

হেমব্রম বলেছেন, দুর্গার নায়িকাত্ব ও মহিষাসুরের খলনায়কত্ব প্রচারিত হয়েছে "In the eyes of the foreigners." অথচ বহিরাগত-হিসাবে আর্যদের ভারত ভূখণ্ডে আগ্রাসনের তত্ত্ব এখন বহু ইতিহাসবিদই খারিজ করে দিয়েছেন।

আর, দেবপক্ষ-অসুরপক্ষের সংগ্রামকে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব বলে দাগিয়ে দেওয়ার যে বাইনারি-তাড়িত প্রবণতা- সেটিও আদ্যন্ত ভুল। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, বৃত্র- পুরাণের তা'বড় তা'বড় খলনায়কদের শরীরে বইতো ব্রাহ্মণ বংশের রক্ত, কী করে তাঁদের খাঁটি অনার্য বলে চিহ্নিত করা হবে? আজ্ঞে হ্যাঁ, মহিষাসুরের ক্ষেত্রেও তাই! মহিষাসুরের পিতা রম্ভাসুর ছিলেন কশ্যপ-পত্নী দনুর সন্তান (দেবীভাগবত)। কশ্যপ ঋষি কে? ব্রহ্মাপুত্র মরীচির পুত্র তিনি। তাঁর পত্নী

দানব-কুলজননী দনুই বা কে? আর এক ব্রহ্মানন্দন প্রজাপতি দক্ষের তনয়া। অর্থাৎ, মহিষাসুরের শরীরে বইছিল ব্রাহ্মণ্য শোণিত! বরাহপুরাণেও তিনি দানবরাজ বিপ্রচিত্তির কন্যা মাহিষ্মতীর গর্ভজাত, এবং দানব বলতেই সেই কশ্যপ ও দনুর ব্রাহ্মণ্য শোণিত স্মরণীয়। কী করে 'মূলনিবাসী অনার্য নায়ক' হবেন তিনি? আজও যে দুর্গাপূজায় দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরকেও রীতিমতো পূজা করা হয়, এবং ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে তাঁকে উপবীতও অর্পণ করা হয়! এবং, মহিষাসুরের ক্ষমতালাভের কারণটিও যে তপস্যার বলে আদায় করে নেওয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার কৃপা!

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, বহু সুপ্রাচীন ভাস্কর্যে দেবী দুর্গা কেবল মহিষমর্দিনী, তাঁর দ্বারা নিহত শত্রুটি আস্ত একটি মহিষ। উদাহরণ, উড়িষ্যার বিরজাক্ষেত্রের বিরজা দেবী- ইনি দ্বিভুজা দ্বিনেত্রা, এক হাতে মহিষের লেজ ধরে আরেক হাতে তাকে শূলবিদ্ধ করছেন, সিংহ বাহনও নেই, প্রায় মানবী-মূর্তি বলা চলে। এছাড়া, রাজস্থানের অম্বিকা ভগবতী মন্দিরের ভাস্কর্যে চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী দেবী, এবং মথুরার ভাস্কর্যের মহিষমর্দিনীর কথা উল্লেখযোগ্য। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত দেবীস্তবে তিনি "মহিষসৃকপ্রিয়ে", মহিষের রক্ত তাঁর প্রিয়। দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুদুর্গা মূর্তিতে তিনি মহিষের মুণ্ডে দণ্ডায়মানা। এইসব ক্ষেত্রে কোথাও মহিষের মনুষ্যোচিত রূপের ইঙ্গিত নেই। তাহলে কি এইটিই অনুমিত হচ্ছে না, যে এই বহু শতাব্দীপ্রাচীন মিথ-প্রবাহে একেবারে শুরুর দিকে দেবী কেবল 'মহিষমর্দ্দিনী'-ই ছিলেন, এবং মহিষকে মায়াবী অসুররূপে কল্পনা পরবর্তীকালীন? যার ট্রাঞ্জিসন ফেজ হচ্ছে মহাবলীপুরমের অর্ধ-মহিষ অর্ধ-নর অসুর, এবং যার সাম্প্রতিকতম রূপ হচ্ছে বঙ্গীয় দুর্গাপ্রতিমার মহিষ থেকে অর্ধনিষ্ক্রান্ত অসুর? অর্থাৎ মহিষ কোথায় বাদ নেই, সমস্ত সংস্করণেই মহিষ আছেই আছে।

তাহলে, বিশাল ভারতভূমি জুড়ে প্রচলিত দুর্গা সংক্রান্ত এই এতগুলি মিথ পরিত্যাগ করে, মহিষের নামগন্ধহীন 'হুদুড় দুর্গা' সংক্রান্ত একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ জনজাতির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ গোষ্ঠীর আখ্যানকে একমাত্র সত্য 'ইতিহাস' বলে মেনে নেবার যুক্তি কী?

আচ্ছা, তাহলে, কেন আর কীভাবে হুদুড় দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরকে মেলাতে চাইলেন হেমব্রম ও তাঁর সঙ্গীরা?

"We call him Hudur Durga; never Mahishasura. Only later we realized that our Hudur Durga is known by others as Mahishasura."- বলেছেন হেমব্রম। ঠিকই, যেমন সাঁওতালদের কিংবদন্তীতে মহিষাসুরের নাম নেই, তেমনই পুরাণে কোথাও নেই হুদুড়ের নাম। তাহলে হেমব্রম কীভাবে এই দুই চরিত্রকে মেলালেন? ফাঁস করেছেন নিজেই। রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিশেষের উত্থান শুরু হওয়ার পর, নিজের জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচয় খুঁজতে গিয়েই তাঁর মাথায় এসেছিল এই চিন্তা। " First the thought of Ravana came to my mind. But the stories of Ravana did not have much intersection with our culture. His land was far away from ours." তাই রাবণ বাতিল হলেন, মঞ্চে নামানো হলো মহিষাসুরকে! এবং, তৈরী হল হিন্দুত্ববাদের Counter-fiction, প্রচলিত হলো Counter-culture। সাঁওতাল-অধ্যুষিত গ্রামের পাশাপাশি, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েও অসুর-পুজো তথা হুদুড়-পুজোর ধুম লাগল!

অর্থাৎ, এই হুদুড় পুজো কিংবা অসুর পুজো আদতে সাঁওতাল গোষ্ঠীর কোনও প্রাচীন ঐতিহ্যই নয়, নিতান্ত হাল আমলে, ২০১১ সালে তৈরী হওয়া একটি রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা মাত্র!

আর, বাঙালির দুর্গোৎসব?

শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রাচীন উল্লেখ রয়েছে দুর্গাসপ্তশতীতেই, "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী" (১২/১২)। মনে রাখতে হবে, শ্রীশ্রীচণ্ডীর মন্ত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়ায় তাতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়, এবং, কোনও সংস্করণে উক্ত মন্ত্রের কোনও পাঠান্তরও পাওয়া যায় না। এই শারদীয়া মহাপূজার বিস্তৃতি পদ্ধতি রয়েছে কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ ও বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণে। দেবীভাগবতে রামচন্দ্রের শারদ নবরাত্রি উদযাপনের কাহিনী রয়েছে, আর কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ-কাব্যে রয়েছে অকালবোধনের বিবরণ।

ইতিহাস বলছে, ৮৮৭ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার তাহেরপুরে, আচার্য রমেশ শাস্ত্রীর বিধানে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন রাজা কংসনারায়ণ। সেখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে দেবীমন্দির, আর তৎসংলগ্ন ফলকে লেখা রয়েছে এই ইতিহাস। অর্থাৎ, কম করেও বিগত পাঁচশো বছর ধরে প্রতি শরতে বাঙালির ঘরে আসছেন মা দুর্গা!

এবং, বাঙালির দুর্গা-ধারণায় দেবী মোটেও আর্য-পক্ষপাতী একদেশদর্শী কোনও চরিত্র নন। মনসামঙ্গল ও শিবায়নে মহাদেবকে ছলনা করতে তিনি ডোম্বী-বেশ ধারণ করেন, তাঁর শবরী রূপের কথা পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণে। দেবীর মাতঙ্গী মহাবিদ্যা রূপ চণ্ডালীরূপে প্রসিদ্ধা। বাংলার জনমানসে দেবীর গণরূপে ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী দৈত্য দানা অত্যন্ত পরিচিত। এসব যে নেহাত প্রাদেশিক ভাবনা কিংবা অর্বাচীন কবিকল্পনা তা মোটেই নয়, বৈয়াসকী মহাভারতেই দেখা গেছে, সগণ কিরাত-রূপী মহাদেবের সঙ্গে কিরাতবধূর বেশে অর্জুনের তপস্যাস্থলীতে পার্বতীর আগমন!

আচ্ছা, আপনারা জানেন কি, এই হুদুড়-পুজো নিয়ে সাঁওতাল গোষ্ঠীর সকলে আদৌ একমত নন? 'দশানি' উৎসব, ওরফে 'দাঁশাই'- কে হেমব্রম বলেছেন হুদুড়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোকপালন, এবং সেজন্যই তাতে ঘটেছে "হায় হায়" শব্দের প্রয়োগ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সর্বত্র মান্যতা পায়নি আদৌ! সাঁওতাল বুদ্ধিজীবী বিবেকানন্দ সোরেন স্পষ্টই জানিয়েছেন, দাঁশাই হলো খরা-কবলিত দশা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, বৃষ্টির জন্য প্রকৃতি-বন্দনার গান। "হায় হায়" শব্দের প্রয়োগ এখানে খরা-জনিত কষ্টের সূচক, কোনও শহীদ-স্মরণের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। (যে কোনও বুদ্ধিজীবীর বিশেষণ হিসাবে তাঁর গোষ্ঠীপরিচয় উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়।)

বর্তমানে, সাঁওতাল গোষ্ঠীর অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিই মহিষাসুরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাইছেন। সুশীল মুর্মু, সুমন্ত হেমব্রম, সন্দীপন কিস্কু- বেলুড়ের শিক্ষামন্দিরের তিন তরুণ ছাত্র স্পষ্টই জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের মহিষাসুরের বংশধর বলে মানেন না। বাঁকুড়ার দোমোহানী গ্রামের সরস্বতী হাঁসদা দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে নিজেই প্রতি বছর সামান্য উদ্যোগে আয়োজন করছেন দুর্গোৎসব! মন্ত্র জানা নেই তো কী, নিজস্ব গান আর ভুয়াং নাচের মাধ্যমেই প্রতি বছর করছেন মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা!

শারদ দুর্গোৎসবের আদিতম উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দুর্গাসপ্তশতী', বা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'। এই গ্রন্থের দেবীলীলা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত, কোনও রাজনৈতিক আধিপত্যের ইতিহাস খোঁজা সেখানে বৃথা। দেবী সেখানে "মহাদেবী মহাসুরী"- তিনিই দৈবীশক্তি ও আসুরীশক্তির একতম উৎস। "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা", অসুর-বিরোধী সংগ্রামে তাঁর বাহ্য-নিষ্ঠুরতার আড়ালে সদাসক্রিয় তাঁর অন্তরস্থ কৃপা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধকের অন্তরস্থ অশুভ প্রবৃত্তির ক্রমাগত বিনাশই, দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যুদ্ধ আকারে উপস্থাপিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তাৎপর্য অনুধাবন না করে, দুর্গোৎসব সম্পর্কে মন্তব্য করা তাই নিতান্তই অনর্থক।

সমস্ত বিতর্ক, সমস্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে সরিয়ে রেখে, এই দুর্যোগ ও দুর্ভোগের বছরেও মা আসবেন বাংলার ঘরে ঘরে। নদীর ধারে চামর দোলাবে কাশবন, গালচে বিছিয়ে দেবে শ্বেতশুভ্র শেফালিকার দল। আর, আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠবে আলোকমঞ্জীর!

এই নিবন্ধটি একটি বহু বছর যাবৎ চর্চিত ঐতিহাসিক বিতর্ক সম্বন্ধে সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস। কোনও ভাষিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত বা বিরূপতা প্রদর্শন এর উদ্দেশ্য নয়।

- উৎসব চৌধুরী

'প্রহর' অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত।।

প্রধান উপদেষ্টা: অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা।।

বেদে ভক্তি কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

একজন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁর গুরুর নিকটেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরাকাষ্ঠা হলো অকৃত্রিম ভক্তি। অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যেরূপ অচলা ভক্তি রয়েছে, সেরূপ অচলা ভক্তি যদি গুরুর প্রতিও থাকে, তবেই সেই গূঢ় ব্রহ্মরহস্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হবে। এজন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গীতা ৪।৩৪

শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম, সেবা দ্বারা এবং নিষ্কপটভাবে প্রশ্ন করে সেই জ্ঞানলাভ করতে হয়। তখন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে সেই জ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করবেন ।

প্রায় সকল টীকাকার ও তথাকথিত আধুনিক বিশেষজ্ঞকের মতে বৈদিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সর্বপ্রথম ভক্তির উল্লেখ এসেছে। কিন্তু সকল বিদ্যার আদি স্রোত হচ্ছে বেদ। বেদেই সর্বপ্রথম ভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—
"ভক্তিবাংসঃ স্যাম্" (অথর্ববেদ ৬।৭৯।৩) অর্থাৎ আমরা যেন ভক্তিমান্ হই ।
আমরা আজ বেদে ভক্তির কী কী স্বরূপ রয়েছে তা সামান্যভাবে দেখবো -

পরমেশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান শ্রবণ

যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি। যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎসেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ ॥

ঋগ্বেদ ১।১৫৬।২

সেই পরমেশ্বর সর্বপূর্ব বিদ্যমান, পূর্ব বিদ্বানদেরও উপাস্য, সদা স্তুত্য, স্বয়ম্ভু ও সর্বব্যাপক । তার জন্য যে দান করে , যে মহান পরমেশ্বরের জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করে সেই জ্ঞান ও গুরুপদেশের মাধ্যমে সেই পরম সখা, যোগ দ্বারা গম্য পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে তারই উপাসনা করে ।

পরমেশ্বরের নাম অর্থভাবনাসহ জপ

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন । আস্য জানন্তো নাম

চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥

ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩

হে স্তুতিকারী স্তোতাগণ ! সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ঋত ও সত্য ধারণকর্তা - প্রকটকারী প্রভুকে যেভাবে জানো সেভাবেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নাও । সেই প্রভুর নামই [অর্থাৎ ওঙ্কার] অর্থ জেনে উচ্চারণ করো । হে সর্বব্যাপক প্রভু ! আপনাকে স্মরণ করে আমরা তেজ ও কল্যাণময়ী মতিকে স্বীয় অভ্যন্তরে ধারণ করি ।

পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তন

বি চক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্ । ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস

উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার ॥

ঋগ্বেদ ৭।১০০।৪

সর্ব্ব্যাপক পরমেশ্বর এই পৃথিবী মানবগণকে দান করে নিবাসের জন্য বিবিধভাবে সৃজন করেন । প্রভুর কীর্তনকারী আত্মাগণ নিত্য । প্রভু পৃথিবীকে বিবিধ জীবের বসবাসযোগ্য এবং উত্তমভাবে জন্তু, বনস্পতি, অন্নাদির উৎপাদক তৈরী করেন ।

প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্ । তং ত্বা গৃণামি

তবসমতব্যান্ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥

ঋগ্বেদ ৭।১০০।৫

হে সর্বস্বামী, সর্বকর্মজ্ঞাতা পরমেশ্বর ! তোমারই কর্ম ও স্বরূপের আজ আমি স্তুতি করি । আমি অল্পশক্তি-বিশিষ্ট মানব তোমার মত বলশালীর স্তুতি করি এবং এই বিশ্ব থেকেও অধিক বিদ্যমান, মহান থেকেও মহান তোমার কাছেই প্রার্থনা করি ।

প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে ।

য ইদং দীর্ঘং প্রয়তং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎপদেভিঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।১৫৪।৩

সেই সর্বব্যাপক প্রভুর জন্যই শত্রুদের শোষণকারী মননীয় স্তোত্র লাভ হোক । প্রভুর জন্য আমার স্তোত্র যা কিনা বেদবাণীতে নিবাস করে তা বিকশিত হয়, সেই প্রভুই কীর্তনযোগ্য, সুখের বর্ষক, সেই প্রভু অদ্বিতীয় একাই এই বিশাল পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত সর্বলোক একত্রস্থিত স্থান অন্তরিক্ষকে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়াত্মক কর্ম দ্বারা বিশেষভাবে নির্মাণ করেন ।

প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত ।
যা সানুনি পর্বতানামদাভ্যা মহস্তস্থতুরর্বতেব সাধুনা ॥
ঋগ্বেদ ১।১৫৫।১

হে প্রজাগণ ! তোমরা ব্রহ্মচর্য শক্তিবলে রক্ষক প্রভুর অর্চনা করো ; যে প্রভু প্রজাদের কাছে বুদ্ধিপূর্বক কর্মের কামনা করেন ; যিনি মহান , শূরবীররূপে আমাদের শত্রুদের বিনাশ করেন এবং সেই সর্বব্যাপক প্রভুরই অর্চনা করো । যেভাবে অশ্ব কোন ব্যক্তিতে নিজের লক্ষ্যে নিয়ে যায় সেভাবেই প্রভুর উপাসক নিজেকে পরিপূর্ণ করে উন্নতির শিখরে স্থাপন করে ।

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি ।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥
ঋগ্বেদ ১।১৫৪।১

এখন আমি শীঘ্রই সর্বব্যাপক প্রভুর শক্তিশালী কাজের কথন করি । যে প্রভু পার্থিবলোককে বিশেষভাবে সৃজন করেন , আমাকে অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট আধার প্রদান করেন ও সৃষ্টি - স্থিতি - প্রলয় করেন বা জ্ঞান - কর্ম - উপাসনার উপদেশ প্রদান করেন সেই প্রভুই গীতযোগ্য ।

পরমাত্মার সেবকরূপে ভক্তি

অরং দাসো ন মীল্‌হুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েনাগাঃ ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥
ঋগ্বেদ ৭।৮৬।৭

আমি পাপভাবনা রহিত হয়ে পালক সর্বসুখদাতা সর্বদাতা স্বামীর দাসের ন্যায় অনেক সেবা করি । তিনি দানশীল প্রকাশস্বরূপ প্রভু সবার স্বামী অজ্ঞানী জন কে সদা জ্ঞান প্রদান করেন এবং তিনি সবার থেকে অধিক বিদ্বান হয়ে নিজ স্তুতিকর্তা ভক্তকে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত করানোর জন্য সন্মার্গে নিয়ে চলেন ।

পরমাত্মাকে মাতা - পিতা ভেবে ভক্তি করা

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ । অধা তে সুম্নমীমহে ॥

ঋগ্বেদ ৮।৯৮।১১

হে সকলের আশ্রয়স্থল, অগণিত শুভকার্যের সম্পাদক পরমাত্মন্ ! তুমিই আমাদের সকলের পিতা, তুমিই মাতা, এজন্য তোমাকে আমরা উত্তম রূপে মনন করি।

ভগবানকে সখা অর্থাৎ বন্ধু ভেবে ভক্তি

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।

যত্রঃ দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥

যজুর্বেদ ৩২।১০

বিদ্বানেরা যে তৃতীয় ধামে মোক্ষ সুখ লাভ করে যথেচ্ছ বিচরণ করেন সেই প্রভু আমাদের বন্ধু ও জনক। তিনি সকলকে ধারণ করে আছেন এবং জন্ম, নাম ও স্থান সমূহকে অবগত আছেন। [সর্বজ্ঞ প্রভুর নিকট কিছুই অজ্ঞাত নাই। প্রথম ধাম জীবের দ্বিতীয় ধাম প্রকৃতির। প্রথম ধাম সুখের, দ্বিতীয় ধাম দুঃখের। পরমাত্মা এই সুখ ও দুঃখের অতীত তৃতীয় ধাম আনন্দরূপে অবস্থান করছেন]

পরমেশ্বরকে রাজা - শাসক রূপে ভক্তি

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ॥

য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যজুর্বেদ ২৩।৩

নিজের মহিমাবলে যিনি চেতন ও জড় জগতের রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর উপর শাসন করছেন, সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা মনের দ্বারা উপাসনা করি ।

হে ভক্তবৃন্দ ! ঈশ্বরের এক ও অদ্বিতীয় -

১] ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে [ঋগ্বেদ ৭।৩২।২৩] অর্থাৎ, হে ঈশ্বর! দিব্য শক্তিসম্পন্ন তোমার মতো আর কোনো সত্তা বা পদার্থ নেই। এমন কোনো সত্তা বা পদার্থ এই পৃথিবীতে কখনো জন্মগ্রহণ করে নি, আর কখনো জন্মগ্রহণ করবেও না।

২] প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব [ঋগ্বেদ ১০।১২১।১০] অর্থাৎ সকল প্রজার বা মানবজাতির অধিপতি ঈশ্বর! তুমি ছাড়া আর কেউ না অর্থাৎ,একমাত্র তুমিই পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছ এই সমগ্র উৎপন্ন মহাবিশ্বকে।

৩] স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা [যজুর্বেদ ৩২।১০]অর্থাৎ, তিনি একাই অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর আমাদের নিকটতম মিত্র একমাত্র তিনিই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, ধারণকর্তা। মহাবিশ্বের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই তিনি অবগত আছেন। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ও গুণ অনন্ত।

তাই আসুন , পরমেশ্বরেরই উপাসনা করি ।

মা চিদন্যদ্বি শংসত [সামবেদ ২৪২] ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু বা কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ, উপাসনা করে বিপর্যস্ত হয়ো না।

ভূমিকম্প সম্পর্কে বেদে কী বলা হয়েছে ?

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের শাস্ত্রে ৩ ধরনের দুঃখের কথা বলা হয়েছে -

১. আধ্যাত্মিক দুঃখ। নিজের মনের অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ এসব পুষে রাখলে এসব দ্বারা মানুষ নিজেই দুঃখ-কষ্ট পায়। তাই এগুলো আধ্যাত্মিক দুঃখ।
২. আধিদৈবিক দুঃখ। প্রকৃতিক বস্তুসমূহ দ্বারা যেসব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেগুলো আধিদৈবিক দুঃখ। যেমন- ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি।
৩. আধিভৌতিক দুঃখ। অন্যান্য প্রাণী, মানব দ্বারা আমরা যেসব দুঃখ-কষ্ট পাই সেগুলো আধিভৌতিক দুঃখ।

[প্রথম সমুল্লাস, সত্যার্থ প্রকাশ ও সাংখ্য দর্শন ১।১ ব্যাখ্যা]
ভূ -অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্যে যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সে শক্তি হঠাৎ মুক্তি পেলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়; এইরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। সাধারণত কম্পন-তরঙ্গ থেকে যেই শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বেশিরভাগ ভূমিকম্পের কারণ হল ভূগর্ভে ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া; কিন্তু সেটা অন্যান্য কারণেও; যেমন: অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, খনিতে বিস্ফোরণ বা ভূগর্ভস্থে নিউক্লিয়ার গবেষণায় ঘটানো আণবিক পরীক্ষা থেকেও হয়ে থাকতে পারে। ভূগর্ভে ভূমিকম্পের প্রাথমিক ফাটলকে বলে কেন্দ্র (ফোকাস) বা অধোকেন্দ্র (হাইপোসেন্টার) এবং অধোকেন্দ্র থেকে উল্লম্ব বরাবর ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কেন্দ্রটিকে উপকেন্দ্র (এপিসেন্টার) বলে।

পবিত্র বেদে ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রার্থনা করা হচ্ছে -

শং নো ভূমির্বেপ্যমানা [অথর্ববেদ ১৯।৯।৮]
অনুবাদঃ ভূমিকম্পে কম্পিত ভূমি আমাদের জন্য শান্তিদায়ক হোক ।

পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী এর তাৎপর্যে বলেছেন,
দূরদর্শী মানব ভূমিকম্প, উল্কাপিণ্ড অধপতিত হওয়া, ভূমিধ্বস, রোগ যাতে গোদুগ্ধ নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি বিঘ্ন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে সুখী হবে।

পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালঙ্কারও এসব আধিদৈবিক কষ্ট যেন আমাদের পীড়িত না করে সেই প্রার্থনা করা হয়েছে বলে ভাবার্থে উল্লেখ করেছেন।

সামবেদেও জীবকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে আদিদৈবিক দুঃখ থেকে নিজেকে পৃথক করে। কেননা আধিদৈবিক দুঃখ মানবকারণেও হতে পারে যেমন অধিক বৃক্ষসংহার, পার্বত্যভূমি নষ্ট করা ইত্যাদি ।

অগ্নে হেডাংসি দৈব্যা যুয়োধি নঃ [সামবেদ ১৬২৪]
অনুবাদঃ হে উন্নতি সাধক জীব ! আমাদের দৈবিক কারণে হওয়া প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করো ।

মহৎসধস্থং মহতী বভূবিথ মহান্বেগ এজথুর্বেপথুষ্টে [অথর্ববেদ ১২।১।১৮]
অনুবাদঃ হে ভূমিমাতা ! তুমি একত্রে বসবাসের জন্য মহান স্থান । তুমি সত্যিই বিশাল । তুমি তীব্র গতিশীল । তোমার কম্পন অর্থাৎ ভূমিকম্পও অত্যন্ত প্রবল ।

ভূমিকম্পে করণীয় -

১। ভূমিকম্প হচ্ছে টের পেলে বা খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা ও উন্মুক্ত স্থানে আশ্রয় নিন।

২। উঁচু ভবনে থাকলে এবং বের হতে না পারলে জানালা বা দেয়ালের পাশে অবস্থান না নিয়ে শক্ত কোনো বীম, টেবিলের নিচে অবস্থান নিন।

৩। হতবিহ্বল না হয়ে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন।

বহুতল ভবনে একই জায়গায় অনেক মানুষ একসঙ্গে না থেকে ভাগ হয়ে আশ্রয় নিন।

৪। আপনার মুঠোফোনে ফায়ার সার্ভিস এবং দরকারি মোবাইল নম্বরগুলো আগাম সতর্কতা হিসেবে আগেই রেখে দিন। বিপদের সময় আপনার কাজে লাগবে।

৫। দ্রুত নামার জন্য ভবন থেকে লাফিয়ে পড়বেন না।

৬। ভূমিকম্পের সময় সম্ভব হলে মাথার ওপর শক্তকরে বালিশ অথবা অন্য কোনো শক্ত বস্তু [কাঠবোর্ড, নরম কাপড় চোপড়ের কুণ্ডলি] ধরে রাখুন।

৭। গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে দূরে অবস্থান নিন।

উচু ভবন থেকে দ্রুত নামার জন্য লিফট ব্যবহার করবেন না।

ভূমিকম্পের সময় গাড়িতে থাকলে গাড়ি খোলা জায়গায় থামিয়ে গাড়িতেই থাকুন।

৮। একবার ভূমিকম্পের পরপরই আরেকটা ছোট ভূমিকম্প হয় যাকে ‘আফটার শক’ বলে। নিজেকে বিপদমুক্ত ভাবতে অন্তত একঘণ্টা সময় নিন ।

এতো বিভক্ত সনাতনী সমাজ ঐক্য আনতে বেদের গুরুত্ব কী ?

দীর্ঘদিন সনাতনী সমাজে বেদচর্চার অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে অনেক অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, নানা গুরু বা নানা নিজ দাবিকৃত অবতার এসেছেন, যাদের কেন্দ্র করে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সম্প্রদায়গুলোর বেশিরভাগ নিজ গুরুর প্রতি অন্ধবিশ্বাসের জন্য গুরুকেই ঈশ্বর মেনে থাকেন। নিজ গুরুকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন এবং শাস্ত্রের বদলে গুরুর নির্দেশিত মতকেই গ্রহণ করেন। এসব গুরুদের অনেকেই আবার সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী।

এভাবেই সনাতনী সমাজ ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। একেক গুরুর একেক মন্ত্র, একেক ঈশ্বর তত্ত্ব, একেক প্রথা ও সংস্কার দেখে ২% দীক্ষিত বাদে বাকি ৯৮% সাধারণ সনাতনী নিজ ধর্ম নিয়ে চরম বিভ্রান্ত। কোন উৎসব পালন করবে, কী খাবে, পশুবলি কি বিহিত নাকি অবিহিত, বর্ণ জন্মগত না কর্মগত, কাকে ও কীভাবে উপাসনা করবে, ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি তত্ত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক, কোন মন্ত্র জপ করবে সবাই এসব সাধারণ ব্যাপারেই তারা বিভ্রান্ত ও একক সিদ্ধান্তহীন। অথচ এসবই আমাদের তথা যে কোন ধর্মীয় সমাজের মূল ভিত্তি।

যারা কিনা এসব ভিত্তিতে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দিয়ে এড়িয়ে যায় বা সবই ঠিক বলে তারাই মূলত বিভ্রান্তকারী শাস্ত্রব্যবসায়ী। যারা ঐক্যের কথা বলে তারা এটাই ভুলে যায় যে যদি মূলটাই ভিন্ন হয় তবে আপাত মধুর ঐক্যের রব কেবল শুনতেই ভালো লাগবে কিন্তু তা কখনোই বাস্তবে ফলপ্রসূ নয়। যদি দশজন সনাতনীকে ডেকে ঈশ্বরের নাম জিজ্ঞেস করা যায়, কেউ হয়তো বলবে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, শিব তার দাস। কেউ বলবে শিব ঈশ্বর কৃষ্ণ শিবের ভক্ত। কেউ বলবে মা দূর্গা বা শক্তি ই ঈশ্বর, বিষ্ণু, শিব এরা সবাই মায়ের সৃষ্টি। কেউ আবার নিজস্ব মতবাদের গুরুদের নাম বলবে ঈশ্বর হিসেবে।

অবশ্যই আমাদের ধর্মে অনেক মহাপুরুষ এসেছেন, যারা নিজ নিজ মতে সাধনা করেছেন এবং সাধারণকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের মত যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এমনটা বলার সুযোগ নেই। একমাত্র ঈশ্বর বাদে কোনো মানবই শতভাগ অভ্রান্ত হতে পারে না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে একমাত্র অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ হলো বেদ। বেদ ব্যতীত বাকি সবাই পরতঃপ্রমাণ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর ২১

তাই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী গুরুর শরণ আবশ্যক যিনি শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করবেন। সেই গুরুর কোনো কথা যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা সেই কথাটি বর্জন করব। গুরুকে ও গুরুর আদর্শকে তথা যেকোন কিছুকেই বেদের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করব।

সনাতনধর্মে নানা গুরুবাদী সম্প্রদায় বা নানা দেবোপাসক সম্প্রদায় নিজস্ব গ্রন্থ বা নিজস্ব পুরাণ রচনা করেছে যাতে সর্বদাই নিজ উপাস্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য অন্য দেবতাকে ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এমন স্ববিরোধী গ্রন্থাদি বর্জন করে কেবল বেদের পথই অনুসরণ করা উচিত আমাদের। ধরি দুটো জায়গা, 'ক' এবং 'খ' বিন্দু। ক থেকে খ তে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ একটাই, যা তাদের সরলরৈখিক দূরত্ব [পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ভেক্টর দূরত্ব]। অন্য যেকোনো পথ সরল পথের তুলনায় জটিল এবং দুরূহ। আবার কোনো কোনো পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার বদলে উল্টোদিকেও নিয়ে যেতে পারে।

কাজেই "যত মত তত পথ" নয়, "বেদের পথই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ"। কাজেই এক মানবজাতি আর্য; এক ধর্ম বৈদিক সনাতন; এক মূল গ্রন্থ বেদ; এক মূল মন্ত্র, গায়ত্রী; এক উপাস্য, নিরাকার পরমাত্মা [ও৩ম্] হলেই বহুমতের ফাঁদে বিভক্ত সনাতনী সমাজের মাঝে একতা আসবে। বৈদিক যুগে সমস্ত সমাজ এভাবেই একমত, একপথের একক সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাই বৈদিক ধর্মও ছিল অপরাজেয়। কালের আবর্তে পৌরাণিক যুগ আসার পর বেদের চর্চা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়, ফলে আমরাও হারিয়ে ফেলি আমাদের গৌরবময় অতীত। দলে দলে পৌরাণিক জাতপাত, কুসংস্কারের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হতে থাকে লক্ষ লক্ষ সনাতনী। আর একমাত্র বেদের একতার পথই পারে এসবের পুনরুদ্ধার ঘটাতে।

আজ 'আর্য সমাজ' পবিত্র বেদের পথ ধরেই প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষকে বৈদিক শুদ্ধিযজ্ঞ করে ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া ভাইবোনদের পুনরায় সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে আনছে। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রাতঃস্মরণীয় শিষ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী প্রথম এই শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন এবং পাঞ্জাবের মালকানা রাজপুত সহ লক্ষ লক্ষ লোককে সনাতনে প্রত্যাবর্তন করান যে ধারা আজও বহমান। আর এগুলো কেবল সম্ভব হয়েছিল পবিত্র বেদে কুসংস্কারহীন, জাতপাতহীন এক মত এক পথের কারণে। পবিত্র ঋগ্বেদের সর্বশেষ সংগঠন সূক্তেরও [১০।১৯১] এটিই প্রতিপাদ্য।

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ। ইডস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥১॥

হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান, নির্মাণ করেছ এই সৃষ্টিকে।

তব মহিমা গায় বেদাদিশাস্ত্র, সমৃদ্ধ করো এই ভূমিকে॥

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবা ভাগং য়থা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।।২।।

প্রেমপূর্বক চল সবাই, যেন মোরা জ্ঞানী হই।

পূর্বজ বিদ্বানদের অনুসরণে, কর্তব্য পালনে ব্রতী হই।।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥৩॥

হোক মতামত সমান সবার, চিত্ত-মন সব এক হোক।

একই মন্ত্রে যুক্ত সকলে, ভোগ্য পেয়ে সবে তৃপ্ত হোক।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো য়থা বঃ সুসহাসতি।।৪।।

হোক সবার হৃদয় তথা সংকল্প অবিরোধী সদা।

মন ভরে উঠুক পূর্ণপ্রেমে, বৃদ্ধি হোক সুখ সম্পদা ॥

তাই চলুন বেদের আদর্শে ফিরে গিয়ে সমস্ত বিশ্বকে পুনরায় আর্য করে তুলি, পুনরায় মহৎ করে তুলি, বাস্তব করে তুলি বেদে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ ও ঐশ্বরিক আহ্বান, কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্। পরিশেষে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে,

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।

মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৩।২৮]

হে ঈশ্বর! তুমি আমাদের অসত্য মার্গ থেকে সত্যমার্গে, অজ্ঞান রূপ অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞান রূপ বৈদিক প্রকাশের দিকে নিয়ে যাও এবং মৃত্যু আদি দুঃখ থেকে মুক্ত করে অমৃতত্বের দিকে নিয়ে যাও এই প্রার্থনা করছি।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান কেন ?

শুধুমাত্র তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই নয়, বরং এই কারণে যে এই ব্রহ্মচারী যোগী মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী -

1. মিথ্যার সাথে কখনই আপস করেননি। সমগ্র জীবন বেদ ও সনাতন ধর্মের প্রচারে উৎসর্গ করেছেন।

2. নারী ও শূদ্রদের তাদের মৌলিক অধিকার প্রদান করেছেন। স্মার্ত ও তথাকথিত পৌরাণিক পরম্পরায় যেখানে নারী - শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ সেখানে তিনি আচণ্ডালে পরমাত্মার সর্বজনীন বেদবাণী প্রচার করেছেন। তাঁদের শিক্ষার ও জাতপাত নিবৃত্তির আদর্শ স্থাপন করেছেন ।

3. ভারতের পরিচয় এবং আত্মমর্যাদা জাগ্রত করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে বিচার করার পথিকৃৎ এবং গৌরবের পুনরুদ্ধার করেছেন ।

4. পরাধীন ঘুমন্ত ভারতের আত্মাকে নাড়া দিয়ে তাকে নবজাগরণ ও সমাজ সংস্কারের পথে চলতে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন কীভাবে ব্যক্তিগত - সামাজিক - রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়ম সম্ভব।

5. ১৮৭৫ সালে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে তিনি স্বদেশী ও স্বদেশী ভাষা শিক্ষা দেন এবং বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু করেন। লবণ করের বিরুদ্ধে তিনিই সর্বপ্রথম গান্ধীরও আগে নিজে রচনায় প্রকাশ করেছিলেন।

6. সর্বপ্রথম, তিনিই আধুনিকসময়ে সংস্কৃতে বেদের বিশুদ্ধ ভাষ্য করেছিলেন। সায়ণ, মহীধর, উবটের অপভাষ্য পড়ে পাশ্চাত্য ও তদানুচর এদেশীয় প্রাচ্য গবেষকদের ভ্রান্তি উন্মোচন করেন ও প্রমাণভিত্তিক খণ্ডন করে বেদকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেন ।

7. সর্বপ্রথম ফিরোজপুরে একটি অনাথালয় খোলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিধবাবিবাহকেই সর্বোত্তম ঘোষণা করেন ও বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ বিরোধ করেন।

8. সর্বপ্রথম, তিনি হরিয়াণার রেওয়ারিতে একটি গোশালা খুলেছিলেন এবং গরু প্রভৃতি পশু, পাখি এবং শাকাহারের গুরুত্ব বোঝাতে 'গোকরুণানিধি' বইটি লিখেছিলেন।

9. সর্বপ্রথম, তিনি আর্য সমাজ সংস্থাপন করেন এবং এতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। পরোপকারিণী সভা অদ্যাবধি সেই ধারা অব্যাহত রেখেছে।

10. সর্বপ্রথম হিন্দিতে তাঁর আত্মজীবনী বলেছেন। আধুনিক হিন্দি ভাষা সাহিত্যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তৎকাল থেকে বর্তমান তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা অতুলনীয়৷

11. ১৮৮২ সালে, গোহত্যা বন্ধের জন্য দুই কোটি স্বাক্ষর সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপন মহারাণী ভিক্টোরিয়ারকে দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী অভিযান শুরু করেন।

12. ভারতে শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য, ১৮৮০ সালে, তিনি সর্বপ্রথম একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর জি. ওয়াইজের সাথে চিঠিপত্র করেন, যাতে ভারতীয় বিদ্যার্থীদের শিল্প-প্রযুক্তি-কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

13. সত্য প্রচারের জন্য তিনি অগণিত অপমান সহ্য করেছেন এমনকি বিষ পান করেছেন, কিন্তু তাঁর বিরোধীদের সম্পর্কে কখনও অনিষ্ট কিছু চিন্তা করেননি, বরং ক্ষমা করেছেন। ৪৭ বার তাঁর প্রাণ হরণের চেষ্টা করা হয়।

14. সত্যার্থ প্রকাশের মতো অমূল্য গ্রন্থ লিখেছেন, যা পড়ে আমরা সত্য-মিথ্যার ভেদাভেদ জানতে পারি। অবৈদিক পৌরাণিক মতবাদ আব্রাহামিক খ্রিষ্টান ও ইসলাম মতের সমালোচনা করে সনাতন ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন৷

15. তিনি দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের সূচনা করেছিলেন, যা জাতীয় জাগরণের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং অনেক বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছিল যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী প্রায় ৮০% স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্যসমাজ থেকে অনুপ্রাণিত ও যুক্ত ।

16. সংস্কারবিধির মতো গ্রন্থ রচনা করে তিনি প্রাচীন বৈদিক ষোড়শ সংস্কারের পবিত্র পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এই সংস্কার একজন মানুষকে প্রকৃত আর্য করে তোলার প্রত্যক্ষ প্রভাবক । শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যে সংস্কার ও প্রার্থনা পদ্ধতি পালন করেছেন ও আমাদের শিক্ষাদান করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি করেছেন ।

17. বৈদিক ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য- তাঁর সাক্ষাৎকার করার জন্য সন্ধ্যোপাসনা , যোগাভ্যাস আদি ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞান - কর্ম - ভক্তির সমন্বয়ে পঞ্চমহাযজ্ঞময় জীবনের প্রচার করেছেন ।

18. ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি - এই তিন অনাদি তত্ত্বের ভিত্তিতে বৈদিক দর্শন তথা ত্রৈতবাদের প্রমাণ স্পষ্টভাবে এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন । জড় জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের শাস্ত্রীয় পথ প্রদর্শন করেছেন।

19. দেশে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস,কুসংস্কার, ভণ্ডামি, কুপ্রথা- কুরীতি, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন ও বৈদিক ধারা পুনঃস্থাপিত করেছেন ।

20. পরিশেষে 'হে ঈশ্বর! 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক' এই বলে তিনি নিজেকে সেই অনন্ত ব্রহ্মের কাছে সমর্পণ করেছেন যা মৃত্যুকালে একজন নিরীশ্বরবাদীকেও আস্তিক করেছিলো।

সবার জন্য বেদ
সবার জন্য ওঙ্কার জপ
সবার জন্য গায়ত্রী মহামন্ত্র
সবার জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞ কর্তব্য
সবাই আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী
- পালন করি ।
জয় শ্রীরাম
জয় শ্রীকৃষ্ণ

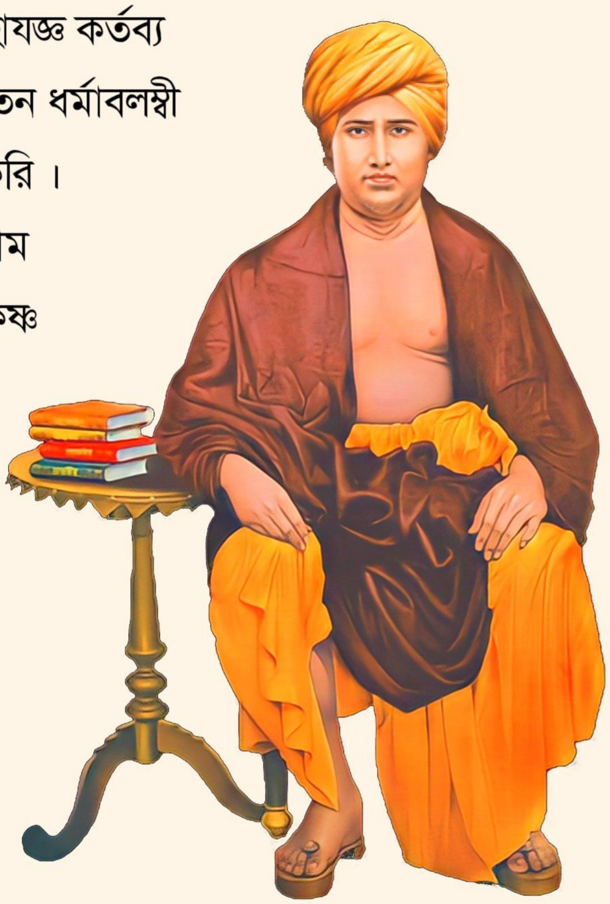

মহর্ষি দয়ানন্দের দেহত্যাগে এক ভক্তের সংস্কৃতে হাহাকার প্রকাশ

অহো নিতান্তং হৃদয় বিদূয়তে নিশম্য লোকান্তরমুন্নতাশয়ম্।
সম্প্রস্থিতং বেদবিদামনুত্তমং শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীং কবিম্ ॥১॥
অর্থাৎ, বেদজ্ঞদের মধ্যে সর্বোত্তম, মেধাবী, উন্নতাশয় শ্রী দয়ানন্দ সরস্বতীর পরলোক গমন শ্রবণে হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়া হয় ।

দীপপংক্তিচিতভূতলে সতি ব্যোম্নি তারকগণৈস্সমুজ্জ্বলে।
শোকজালতিমিরাকুলে তু সত্যুৎসসর্জ স শরীরবন্ধম্ ॥২॥
অর্থাৎ,পৃথিবীতে প্রদীপের সলতে জ্বলনের সময়, তারাগণের আকাশে প্রজ্জ্বলনের সময় এবং শোকরূপী অন্ধকার বিস্তার ঘটলে তিনি শরীর বন্ধন ত্যাগ করলেন ।

নিঃশেষপীতাখিলশাস্ত্রসারঃ পূতান্তরাত্মা নিগমাগ্নিজালৈঃ।
জ্ঞানোত্তমৈকাজজনলিপ্তনেত্রো ব্রহ্মৈকনিধ্যানবিশুদ্ধচেতাঃ॥৩॥
স্বকীয়দেশোন্নতিমাত্রলগ্নঃ স্বপ্নেঽপি ন প্রাপ্তনিজার্থবুদ্ধিঃ।
ত্যক্ত্বা সমস্তং তু কথন্নু কার্যং গন্তু দ্যুলোকং স মনশ্চকার ॥৪॥
অর্থাৎ,যিনি শাস্ত্রসমূহের সমস্ত সার পান করেছিলেন, বেদাগ্নিতে যার অন্তরাত্মা পবিত্র হয়েছিলো, উত্তম জ্ঞান যার অঞ্জন স্বরূপ ছিলো, যার চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে বিশুদ্ধ ছিলো, যিনি স্বদেশের উন্নতিতে সর্বদা সংলগ্ন ছিলেন, যাঁর স্বপ্নেও কখনো স্বার্থবুদ্ধি আসতো না তিনি সর্বকার্য পরিত্যাগ করে দ্যুলোক গমনের চিন্তা কেন করলেন ?

বিজ্ঞায় তস্যাদ্ভুতচারুবৃত্তং দিবৌকসো জাতকুতূহলাঃ কিম্। তদ্দর্শনায়াত্মনিকেতনং তমজূহবন্দিব্যগুণৈরূপেতম্ ॥৫॥
অর্থাৎ,স্বর্গদেবগণ মহর্ষির অদ্ভুত ও সুন্দর চরিত্র শুনে কৌতুহলবশত সেই দিব্যপুরুষকে নিজের গৃহে দর্শনের জন্য নিয়ে গেলো না তো ?

কৃতযুগোচিত এষ জনঃ কিল ন চিরমর্হতি বস্তুমসৌ ময়ি।
মনসি সঙ্কলিতং কলিনেতি কিং স চ হৃতোহখিলসাধুমনোরথৈঃ॥৬॥

অর্থাৎ,সত্যযুগের উপযুক্ত গুণযুক্ত দেখে ' ইনি তো আমার দ্বারা আর বেশী সময় স্থান দেওয়ার নয়' এই ভেবে কলিযুগ শুভচিন্তায় তাকে হরণ করলো না তো ?

গুণানপেক্ষেণ নিজপ্রভুত্বং কালেন কি দর্শয়িতুং হৃতঃ সঃ।
ন দেহভাক্ প্রাক্তনকর্মযোগাৎ পুনঃ প্রপন্নঃ প্রকৃতিং নিজাং বা ॥৭॥

অর্থাৎ,যে কাল গুণের অপেক্ষা করে না সেই কাল নিজের প্রভুত্ব দেখানোর জন্য তাঁকে হরণ করেনি তো ? তিনি নিজের পূর্বকালীন কর্মের যোগে যে মানবশরীর পেয়েছিলেন তিনি আহার পূর্ব প্রকৃতি লাভ করেননি তো ?

সন্দেহদোলামধিরূঢ়মেবং মনো ন নিশ্চেতুমলং মদীয়ম্।
চিত্রং নিগূঢ়ং চরিতং বিধাতুর্বেত্তুং ক্ষমঃ কো বদ মানুষোহস্তি ॥৮॥

অর্থাৎ,এইভাবে সন্দেহের দোটানায় আমার মন কিছুই স্থির করতে পারছে না । বিধাতার চরিত্র বিচিত্র ও কে-ই বা সেই অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব জানতে পারে ? [অতঃ পূর্বোক্ত যে অজ্ঞানবশতঃ শোকাভিভূতাবস্থায় পৌরাণিক দেব - স্বর্গ - কাল ইত্যাদির চিন্তা তা ভ্রান্ত]

দিনানি পূর্বং কতিভিদ্য আসীদসংহৃতাস্মন্নয়নোৎসবায়।
স্মৃতেস্স পন্থানভিতোহধুনা তৎ কথং বিধেঃ স্যাল্লষিতং প্রমেয়ম্ ॥৯॥

অর্থাৎ, কিছুদিন আগেও তো আমার চোখের সামনে আনন্দদাতা ছিলেন তিনি এখন স্মৃতির পথে পৌঁছে গিয়েছেন । বিধাতার ইচ্ছা কি জানা সম্ভব ?

তাতগেহবসতির্বিমানিতা সংশ্রিতশ্চরম্ এবং চাশ্রয়ঃ ।
ধর্মতত্ত্বপরিবোধনে রতস্তেন সোঢ়মপি দুর্বচো নৃণাম্ ॥১০॥

অর্থাৎ, তিনি পিতার ঘর ত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করলেন, ধর্মতত্ত্ব জানাতে থাকলেন, তিনি মানুষের দুর্বচনকেও সহ্য করেছেন ।

স্বং বিহায় মুহুরুচ্ছ্রিতং দং বারিদঃ শ্রয়তি বাহিনীতটম্ ।
কেবলং পরহিতে কৃতশ্রমা লাঘবং ন গণয়ন্তি সজ্জনাঃ ॥১১॥

অর্থাৎ, যেভাবে মেঘ তার উঁচু স্থান ত্যাগ করে বারংবার নদীর তটে আশ্রয় নেয় তেমনি পরহিতের জন্য পরিশ্রমকারী সজ্জন নিজের অপমানকে চিন্তা করেন না ।

যঃ পাখণ্ডমতৈকখণ্ডনরতো বৈদাখ্যশস্ত্রৈঃ শুভৈঃ,

শাস্ত্রাণাং বলবদ্বলেন সততং সংসেব্যমানো যুধি।

সৎপক্ষঃ পরিষচ্ছলেন বিজয়স্তম্ভান্ সমারোপয়দ্,

দিক্ষ্বন্যঃ পুরুষো হি তেন সদৃশো লভ্যেত কুত্রাধুনা ॥১২॥

অর্থাৎ, যিনি বেদ নামক শুভ শাস্ত্রের দ্বারা পাখণ্ডমতদের খণ্ডনে নিরন্তর যুক্ত ছিলেন, যার যুদ্ধে শাস্ত্রের বলবান সেনা সেবা করতো, যিনি সভাতে সর্বদিকে বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করেছিলেন এখন তাঁর সমতুল্য মানব কোথায় পাওয়া যাবে ?

এক এব খলু পদ্মিনীপতিরেক এব দিবি শীতদীধিতিঃ ।

এক এব চ স বেদবিদ্ভুবি দ্বিত্বমত্র ন কদা শ্রুত ময়া ॥১৩॥

অর্থাৎ,পদ্মিনী পতি সূর্য একটিই, আকাশে চাঁদও একটি। এমনই পৃথিবীতে তৎকালে বেদজ্ঞাতা তিনি একজনই ছিলেন, এ বিষয়ে দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব আমি কখনো শুনিনি ।

স্যাৎপুনস্তরণিরক্ষিগোচরো দৃশ্যতে নভসি চন্দ্রমাঃ পুনঃ।

যাত এষ তু সকৃৎসদগ্রণীর্বাভবীতি বিষয়ো ন নেত্রয়োঃ ॥১৪॥

অর্থাৎ,সূর্য তাও আবার দেখা যাবে, চাঁদও আকাশে আবার দেখা যাবে কিন্তু এই সৎমানবদের অগ্রণী এক বার চলে গিয়েছেন আর চোখে দেখার মত বিষয় হবেন না ।

ইন্দ্রিয়ার্থোদ্ভবং জ্ঞানং সর্বথা ন প্রমাত্মকম্।

তচ্ছ্যুতস্স মহাত্মাতঃ স্মৃতাবেব নিধীয়তাম্ ॥১৫॥

অর্থাৎ,ইন্দ্রিয় ও অর্থ হতে উৎপন্ন জ্ঞান সর্বথা প্রমাণিক হয় না, এজন্য সেই মহাত্মা তা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, এখন তাকে স্মৃতিতেই রাখুন ।

সংস্কৃতা ভারতী যেন বৃদ্ধিং যায়াদন্তরতম্।

তস্য নামামরং চ স্যাদিত্যেতদ্ যবসীয়তাম্ ॥১৬॥

অর্থাৎ, যাতে সংস্কৃত ভাষা নিরন্তর বৃদ্ধি পায় ও তাঁর নাম অমর হয় এমন চেষ্টাই করা উচিত ।

ঋষয়ঃ কবয়ো নষ্টা বিদ্বাংস্যোপি তথৈব চ।

সাধুনাং মরণাৎপশ্চাদভিধানং তু জীবতি ॥১৭॥

অর্থাৎ, ঋষি, কবি ও বিদ্বান্ সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সাধুদেরও মৃত্যুর পরে কেবল তাঁদেরই নামই জীবিত থাকে ।

কো নাম শ্রীদয়ানন্দাৎসাধীয়ান্ দৃশ্যতে জনঃ।
উজ্জীবিতার্ষবিদ্যা যেনাস্মাভির্নিরপেক্ষিতা ॥১৮॥

অর্থাৎ, শ্রী দয়ানন্দের ন্যায় সাধু মানব কাকে দেখা যায় যিনি কিনা আমাদের উপেক্ষিত আর্ষবিদ্যাকে পুনর্জীবিত করেছেন ।

সৈবৈষা নীয়তাং পুষ্টিং স্বকীয়হিতবৃদ্ধয়ে।
শাস্ত্রতত্ত্বাববোধেন যূনাং সংস্ক্রিয়তাং চ ধীঃ ॥১৯॥

অর্থাৎ, সেই আর্ষবিদ্যাকে নিজের হিতের জন্য পরিপুষ্ট করো, শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যুবকদের বুদ্ধি সংস্কার করো ।

কঃ পদ্মিনীনাং বদ তিগ্মদীথধিতির্ধর্মঃ পরঃ কঃ কবি বাচি কঃ স্থিতঃ।
কা কণ্ঠভূষা ন যমাদ্বিভেতি কঃ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যমী ॥২০॥

অর্থাৎ,

১- সূর্য পদ্মিনীর কে ?

২- পরম ধর্ম কোনটি ?

৩- কবির বাণীতে কি বিদ্যমান থাকে?

৪- কণ্ঠের ভূষণ কী ?

৫- যমকে কে ভয় পায় না ?

উত্তর যথাক্রমে ১- স্বামী, ২-দয়া, ৩-আনন্দ, ৪-সরস্বতী, ৫-যমী ।

কেন আমি মহর্ষি দয়ানন্দের শিক্ষাকে অনুসরণ করবো ?

১। মহর্ষির সত্যিকারের অনুসারী ভূত-প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী-শাকিনী ইত্যাদি কল্পিত সত্ত্বাকে কখনো ভয় পায় না । সত্য তো এটাই - ' ভূত প্রেত নিকট নহী আবে, আর্যসমাজ জব নাম সুনাবে ' ।

২। আপনি ফলিত জ্যোতিষ, জন্মপত্র, মুহুর্ত, শুভ-অশুভ গ্রহের ফল, মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর জালে পড়ে নিজের অর্থ ও সময় নষ্ট করবেন না ।

৩। কোন পাষণ্ড, ভণ্ড, মিথ্যুক সহজে পুণ্য আর মুক্তির লোভ দেখিয়ে নিজের উদরপূর্তি করতে পারবে না ।

৪। তান্ত্রিক ভূতপ্রেতসহ যে অন্যাদি কাল্পনিক সত্ত্বা আপনার অনিষ্ট করবে এই ভেবে ভীত হবেন না ।

৫। আপনি মদ্যপান, ধূমপান বিভিন্ন মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকবেন ।

৬। বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধবিবাহ, নারী নিপীড়ন, জাতপ্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবেন ও বৈদিক সাম্যবাদের চেতনায় সমুজ্জ্বল থাকবেন

৭। জীবনের লক্ষ্য সরল হবে ও মিতব্যয়ী হবেন । যৌতুক আদি কুসংস্কার ও অপব্যয় রোধ হবে এবং অর্থ-সম্পদ ভালোকাজে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করবেন ।

৮। স্বদেশ - স্বভাষা - স্বধর্ম ও মানবপ্রেমী হবেন ।

৯। অন্ধানুকরণে নৈতিকতাহীন তথাকথিত সংস্কৃতি ও দুর্ব্যসন থেকে দূরে থাকবেন ।

১০। সন্তানদের মধ্যে উত্তম সংস্কারের বীজ রোপিত হবে, ভবিষ্যতে যা তাকে শিষ্টাচার, বয়োজ্যেষ্ঠদের আজ্ঞাপালক, অনুশাসিত ও আদর্শ মানবের প্রতিমূর্তি হিসেবে গড়ে তুলবে ।

১১। নিজের কর্মক্ষেত্র যার যেটাই হোক না কেন তাতে সময়ানুবর্তী, নিয়মতান্ত্রিক ও সৎ হবেন ।

১২। বেদাদি সৎ-শাস্ত্রের স্বাধ্যায়ে আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি হবে ।

১৩। জীবন ও জগৎ বিষয়ে আপনার চিন্তাধারা মানবীয় মূল্যবোধ ও অধিকাধিক বৈজ্ঞানিক হবে । একেই মহর্ষি 'সৃষ্টিক্রমের অবিরোধী ' বলেছেন । আপনি এই ভিত্তিতেই কিছু স্বতঃপ্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তি, তর্ক ও বিবেকের মানদণ্ডে সত্যকে স্বীকার করবেন ।

১৪। মহর্ষির শিক্ষাপ্রণালী আপনাকে সম্পূর্ণ আদর্শ মানব হিসেবে প্রস্তুতের জন্য যথাযথ । আপনি তথাকথিত মতবাদ বা সাম্প্রদায়িক বেড়াজাল ভেদ করে সত্য সনাতন ধর্মের ছায়া বিশুদ্ধ মানব হবেন যে কিনা কেবল শারীরিক গঠনে নয় বরং চিন্তাশীলতার দিক দিয়েই মানব ।

১৫। নিন্দা - স্তুতি, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির বশীভূত না হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারবেন ।

১৬। নানা মতপথের বিভ্রান্তি ত্যাগ করে এক অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসক হবেন ।

১৭। সমগ্র জীবন বেদপ্রতিপাদিত পঞ্চমহাযজ্ঞ পালন করবেন যা কিনা আপনার ব্যক্তিগত - পারিবারিক - সামাজিক - রাষ্ট্রীয় উন্নতি ঘটিয়ে বিশ্বমানবতার কল্যাণ করে আপনাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর এই শিক্ষা লাভ করে নিজেকে বেদের আলোয় আলোকিত করে মানবজন্ম সফল করতে কি আপনি চান না ? তাহলে আজই মহর্ষির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে যোগ দিন আমাদের সাথে ও সনাতন ধর্মের প্রচার - প্রসার করে সমগ্র জগতকে করুন শ্রেষ্ঠ " কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ " ।

হিন্দুধর্ম নিয়ে পাদ্রীকে মোক্ষম জবাব দিলেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীজী'র জীবদ্দশায় নানা শাস্ত্রার্থ ও প্রশ্নের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে । এমনই এক সময় ১৮৭৭ সালের দিকে পাদ্রী ও কমিশনার এইচ. পরিকিংসের সাথে তাঁর নিম্নলিখিত আলোচনা হয় ।

পাদ্রী এইচ. পরিকিংস সাহেব, কমিশনার অমৃতসর— 'হিন্দু ধর্ম সুতার তন্তুর মতো দুর্বল কেন?'
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজী — ' এই ধর্ম সুতার তন্তুর মতো দুর্বল নয়, বরং লোহার থেকেও দৃঢ় । লোহা ভেঙ্গে গেলে তো ভেঙ্গেই যাবে কিন্তু এটি কখনো ভাঙ্গার মতো অবস্থায় আসবে না।'
পাদ্রী মহোদয়— 'আপনি কোনো উদাহরণ দিন তবেই আমার বিশ্বাস হবে।'
স্বামীজী— 'হিন্দু ধর্ম সমুদ্রের গুণ ধারণ করে; যেরূপ সমূদ্রে অসংখ্য ঢেউ উঠে থাকে সেরূপ এই ধর্মতেও দেখুন।

(১) এমন লোকেদেরও একটি মত আছে, যারা জল শোধন করে পান করে যাতে জলের মাধ্যমে কোনো অণুজীব তাঁদের পেটে না যেতে পারে।
(২) একটি মত এমন লোকেদেরও আছে, যারা দুগ্ধাহারী অর্থাৎ কেবল দুধ পান করে; অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করে না।
(৩)সেই সাথে একটি মত এমন লোকেদেরও আছে, যাদেরকে বামমার্গী বলা হয়। তাঁরা যা কিছু পায় সেটা পবিত্র-অপবিত্র, যোগ্য-অযোগ্যের বিচার করা ছাড়াই খেয়ে নেয়।
(৪) একটি মত এমন লোকেদেরও আছে, যারা জীবনভর যতি থাকেন অর্থাৎ না তো কোনো মহিলাকে বিবাহ করেন আর না কারোর উপর কুদৃষ্টি দেন।
(৫) একটি মত এমন লোকেদেরও আছে, যারা পরস্ত্রী আসক্ত হয়ে সম্মান নষ্ট করে ।
(৬) একটি মত এমন লোকেদেরও আছে, যারা কেবল নিরাকার পরমাত্মারই পূজা করে; তাঁর ধ্যান করে।
(৭) আবার একটি মত এমন লোকেদেরও আছে, যারা অবতারদের পুজা করে।
(৮) একটি মত এমন আছে যে যারা কেবল জ্ঞানী ।

(৯) একটি মত এমন আছে, যারা কেবল ধ্যানী ।

(১০) এই ধর্মে সেই লোকেরাও আছে, যারা অস্পৃশ্যতা নিয়ে এমন বিচার করে যে অন্য মতের লোক তো একদিকে, শূদ্রদের হাতের জলও খায় না, আর না খাবার খায়।

(১১) একটি মত সেই লোকেদেরও আছে, যারা শূদ্রদের হাতে জল পান করে এবং এদের সাথে খাবার তৈরি করে খায়। এতো কিছু হওয়ার পরেও তাঁদের সবাইকে হিন্দু বলা হয় এবং বাস্তবেও হিন্দুই। কেউ এদেরকে হিন্দু ধর্ম থেকে সরাতে পারবে না। এজন্য বুঝা উচিৎ যে, এই ধর্ম অত্যন্ত পরিপক্ব, অপক্ব নয়।

পিরিকিংস সাহেব— 'আপনি কোন প্রকার মত বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন?'

স্বামীজী—

'আমি কেবল এটা চাই যে, সকল লোক পবিত্র বেদের আজ্ঞা পালন করবে এবং কেবল নিরাকার, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজা এবং উপাসনা করবে। শুভ গুণ আদিকে গ্রহণ করবে এবং অশুভ গুণ আদিকে ত্যাগ করে দিবে।

('আর্যদর্পণ' খণ্ড ৩, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ২৬,২৭ উদ্ধৃত)।

অর্থাৎ সনাতন ধর্মেও কালক্রমে ভালো-মন্দ অনেক কিছুরই অনুপ্রবেশ ও মিশ্রণ ঘটেছে । তাই বলে কেউ সনাতনের বাইরে নয় , বরং সনাতন শুদ্ধতার পথে অগ্রসর হতে শেখায় । মহর্ষিও তাই সনাতন ধর্মে মতের বিভিন্নতার বর্ণনা করেও পরিশেষে "যত মত তত পথ " না বরং বেদের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেছেন । অবিশ্বাসী বলে প্রাণনাশ করা সনাতন পরম্পরার অংশ নয় । মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী "হিন্দু" শব্দটি অর্বাচীন ও বিদেশী প্রভাবিত বলে ব্যবহার করতেন না , কিন্তু এখানে পাদ্রীর প্রশ্নের সমুচিত জবাবে তাঁর বোধগম্যতার জন্য সেই শব্দ ব্যবহার করেই উত্তর দিয়েছেন ।

সূত্রঃ পণ্ডিত লেখরাম কৃত জীবনী , পৃষ্ঠা ৩৩৯-৪০।

পশুবলি বিষয়ে শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসককে নিয়ে নাস্তিক - পৌরাণিকদের মিথ্যাচার খণ্ডন

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী মীমাংসা দর্শনের বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । তিনি মীমাংসা দর্শনের শাবরভাষ্যের অনুবাদ ও তার উপর বিবেচনাত্মক 'বিবরণ' নামে বিশেষ ব্যাখ্যাও করেছেন । পূজ্য আচার্যপাদ আলোচনার সময় প্রচলিত নানা অবধারণার উল্লেখ করেছেন ও তার সপ্রমাণ খণ্ডন বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । অধুনা সময়ে নববৌদ্ধগণ আর্যশাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় দিনাতিপাত করছে । বঙ্গনাস্তিকদের সংশয় নামে একটি ওয়েবসাইটে বৌদ্ধ নাস্তিক সুরেন্দ্র কুমার অজ্ঞাতের 'বালুর ভিতের ওপর কি দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুধর্ম ' বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । যাতে নাস্তিক সুরেন্দ্র আর্যশাস্ত্রের বিকৃত উদাহরণ দিয়েছে । এমনকি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসকজীর বাক্যও খণ্ডিত উদ্ধৃতি দিয়েছে । বাংলার অকালকুষ্মাণ্ড পৌরাণিকমণ্ডলী ভিক্ষান্নজীবীরূপে সেইসব লেখাকেই উপজীব্য করে অপপ্রচারে লিপ্ত । আসুন তাদের সেই মিথ্যাচারের খণ্ডন করি ।

অপপ্রচারঃ এর পরে টিপ্পনী করে মীমাংসক মহাশয় লিখেছেন, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ভ্রান্তি দূরকারী। তিনি লিখেছেন, " ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই মৃত পশুর মাংসখণ্ড বন্টন এটা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঐতরেয়ের মূল প্রবচন কালে (অর্থাৎ যখন এটা প্রথম লেখা হয়েছিল) অথবা শৌনক দ্বারা এর পুনঃসংস্কারের কালে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে পশুর বলি দিত এবং যজ্ঞশিষ্ট (যজ্ঞের অবশিষ্ট পদার্থ) ভক্ষণ করতো। কেউ একে প্রক্ষেপ বলতে পারেন কিন্তু মীমাংসক মহাশয় একে প্রক্ষেপ (পরবর্তীতে কারো দ্বারা মেশানো) মানতে একেবারেই অস্বীকার করে লিখেছেন, " অথবা এই পশুবলি এবং যজ্ঞীয়মাংসশেষ (যজ্ঞের অবশিষ্ট মাংস) ভক্ষণ পরবর্তীকালে প্রক্ষেপ করা হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রক্ষেপ মনে করার জন্য কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ নেই।" (মীমাংসা শাবরভাষ্যম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৫)

জবাবঃ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী লিখেছেন -

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই বধকৃত পশুর মাংস খণ্ডের বণ্টন স্পষ্ট ঘোষিত করে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মুল প্রবচনকালে অথবা শৌনক দ্বারা পুনঃসংস্কার কালে যজ্ঞে পশুবলি ও যজ্ঞশিষ্ট প্রসাদরূপে মাংস ব্রাহ্মণরা ভক্ষণ করতেন । অথবা এই পশুবলি ও যজ্ঞীয় মাংসশেষের ভক্ষণ উত্তরকালের প্রক্ষেপ হতে পারে । কিন্তু প্রক্ষেপ মানার জন্য কোন সুদৃঢ় প্রমাণ নেই । পবিত্র হিংসারহিত অধ্বর = যজ্ঞেও আসুর প্রভাব অথবা বামমার্গীয় প্রভাব পড়েছিলো এমন সম্ভাবনাই অধিকতর যৌক্তিক।

আমরা প্রথমভাগে শ্রৌতযজ্ঞ মীমাংসা নিবন্ধে প্রাচীন আর্ষ বাঙ্ময় থেকেই সপ্রমাণ উদ্‌ঘোষিত করেছি যে অতিপুরাকালে যজ্ঞে পশ্বালম্ভন হতো না । যজ্ঞে পশ্বালম্ভন উত্তরকালে আরম্ভ হয়েছিলো ।

[মীমাংস দর্শন ৩।৭।২৮, বিবরণ, পৃষ্ঠা ১০৭৫]

লক্ষ্যণীয় -

১। যুধিষ্ঠিরজী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মূল বা পরের কাল এভাবে দুটি বিকল্প দিয়েছেন এই প্রকরণ যুক্ত হওয়ার । অর্থাৎ আদি থেকেই ছিলো এর একক সিদ্ধান্ত দেননি । ২। তিনি আদিবিধানে পশুবধ মানেননি । সুতরাং তিনি পশুবধ সমর্থন করেছেন এটা বলার সুযোগ নেই ।

৩। প্রক্ষিপ্ত কেন না এটার জন্য টীকায় তিনি বলেছেন -

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্য অধ্যায়ে অনেক খণ্ড রয়েছে। কিন্তু এই ৭ম পঞ্চিকার এই ৩১তম অধ্যায়ে একটি খণ্ডই রয়েছে। আর তাতে পশুর মাংসখণ্ড বিভাগই বর্ণিত হয়েছে । এটি বৈলক্ষণ্য বিচারণীয় ।

অর্থাৎ এই প্রকরণ প্রক্ষিপ্ত না । কেননা এই অধ্যায়ে খণ্ড মাত্র একটিই । তবে ' এটি বৈলক্ষণ্য বিচারণীয় ' পদ দ্বারা তিনি এই বিষয়ে যে বিশেষ বিচারের উল্লেখ করেছেন তার পরিপূর্ণ সমাধান আমরা পাই পণ্ডিত শ্রী ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদীজীর গোপথ ব্রাহ্মণে [১.৩.১৮] যেখানে তিনি এর রূপক ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন ।

অপপ্রচারঃ মীমাংসা দর্শনের সূত্র, শমিতা চ শব্দভেদাত্ (৩/৭/২৮) এর ব্যাখ্যার বিবরণে পণ্ডিত যুধিষ্ঠীর মীমাংসক 'কুতুহলবৃত্তি' পুস্তকের আধারে লিখেছেন – শমিতা তাকে বলা হয় যে ঋত্বিক (যজ্ঞের পুরোহিত) পশুর মুখ নাক প্রভৃতি বন্ধ করে তাকে হত্যা করে। শমিতা দুই প্রকারের হয়। এক সংজ্ঞপনকর্তা (মুখ নাক প্রভৃতি বন্ধ করে যে পশুকে হত্যা করে), দুই বিশসিতা অর্থাৎ যে পশুকে কাটে। (মীমাংসা শাবরভাষ্য, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৭)

জবাবঃ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী লিখেছেন -
শমিতা ২ প্রকারের হয় - যজ্ঞপয়িতা = হত্যাকারী এবং বিশসিতা = অঙ্গ কর্তনকারী ।

পাঠক, অপপ্রচারকারীদের অনুবাদে অযাচিতভাবে প্রবেশ করানো শব্দ দিয়ে বুঝতে পারছেন কী পৌরাণিক ও নাস্তিকরা কতটা বিকৃতভাবে তথ্য উপস্থাপন করে ? পাশাপাশি কুতুহলবৃত্তিকারের উত্থাপন প্রচলিত মত প্রদর্শনে মাত্র । কেননা এই প্রকরণে প্রচলিত মত নিয়েও আলোচনা হচ্ছে যা আমরা পূর্ব খণ্ডনে বলেছি । বিপক্ষ মত উদ্ধৃত করা মানে তা স্বীকার করে নেওয়া এমন চিন্তা একমাত্র মূর্খ ব্যতীত করা সম্ভব নয় ।

তিনি আরো লিখেছেন -

উক্ত বিচার যজ্ঞে পশ্বালম্ভনের আরম্ভ হওয়ার উত্তরকালের । পুরাকালে যখন পর্যগ্নিকরণের পর পশুমাত্রের উৎসর্গ হয়ে যেতো তখন না পশুভাগ হতো না কোন ভাগ কার এই বিচারের আবশ্যকতা ছিলো আর না শমিতা ঋত্বিকদের মধ্যে অন্যতম হবে বা পৃথক এই বিচার উপপন্ন হতো । সম্প্রতি উপলভ্যমান শাখা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রোক্তগ্রন্থ ।

তাই এতে প্রাচীনকালের ব্যবস্থাও ক্বচিদুপলব্ধ হয় এবং নবীন ব্যবস্থার তো ব্যাখ্যা করেই । মন্ত্রসংহিতাগত যজ্ঞ আধিদৈবিক যজ্ঞ। তাতে সৃষ্টিযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত দেবযজ্ঞের সাথে আসুরযজ্ঞেরও বর্ণনা আছে । সেই আধিদৈবিক পশুযাগ নিদর্শনার্থ । নাট্যস্থানীয় যজ্ঞকর্মে পশুবধ সেভাবেই বর্জনীয় যেভাবে নাটকে হত্যা-কর্তন বর্জিত । এজন্য যজ্ঞে পশুদের পর্যাগ্নিকরণের পর উৎসর্গই প্রাচীনকালে হতো । কর্মের পূর্তি যদ্দেবত্যঃ পশুঃ তদ্দেবত্যঃ পুরোডাশঃ নিয়মে পুরোডাশ দ্বারাই করা হতো । বিশেষ আমার শ্রৌতযজ্ঞ মীমাংসা প্রকরণে দেখো ।
[মীমাংস দর্শন ৩।৭।২৯, বিবরণ, পৃষ্ঠা ১০৭৭]

আশা করি পূজ্যপাদ আচার্যজীর মন্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট । অপপ্রচার থেকে দূরে থাকুন । নতুবা এভাবেই খণ্ডিত হবেন সত্যের সামনে ।

ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখায় কি কালিয় নাগ ও শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে ?

আর্যসমাজের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অপ্রামাণিক উদ্ধৃতি দিতে দিতে অনেকেই সংজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন । কিছু কিছু নিবন্ধে অযাচিতভাবে আর্যসমাজ বা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকে না আনলে অনেকেরই নিজের আত্মপ্রশংসা করার সাধ কিংবা মুষ্টিমেয় কিছু চাটুকারকে তুষ্ট করা সম্ভব হয় না । সাম্প্রতিক সময়ে ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখার খিল ও এক্সট্রা সূক্ত বা মন্ত্র যা কিনা মূল শাকল শাখায় নেই তা নিয়ে বেদে অমুক সাকার দেবতা কিংবা পূজার উল্লেখ আছে দেখানোর অপচেষ্টা চলছে । আমরা ইতোপূর্বে আশ্বলায়ন শাখায় দুর্গা নিয়ে এহেন অপচেষ্টার সপ্রমাণ খণ্ডন করেছি ও এসব মন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন -

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/08/blog-post_9.html?m=1

প্রথমত আমাদের জানতে হবে শাখা কী! মীমাংসানুযায়ী শাখার উৎপত্তি প্রবচনের জন্য। শাখা মূলত স্থানভেদে প্রবচনের জন্য সৃষ্ট বেদের সংরক্ষণ পদ্ধতি। দেখা গেল, কোনো এক ঋষির নিকট হতে তাঁর শিষ্যগণ গুরুপরম্পরায় বেদ শিখে, নানা স্থানে প্রচার ও প্রবচন আরম্ভ করলেন। কালক্রমে তাঁদের ও শিষ্য হল ও এভাবে শাখার সৃষ্টি হল। চার বেদের এমন অনেক শাখা থাকলেও, মূল নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

বিন্যাস, পাঠের নিয়ম, উচ্চারণে শাখাভেদে পার্থক্য থাকলেও সাধারণত সব শাখার সংহিতা একই হবার কথা। কারণ সেগুলো কমন সোর্স থেকে এসেছে। যদিও শাখাভেদে নিজস্ব ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ সম্ভব; তবে বেদ সব শাখাতেই সমান হবার কথা যদি তা যথাযথ সংরক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের তিনটি শাখা পাওয়া যায়, শাকল, বাস্কল ও আশ্বলায়ন। তবে অনুক্রমণিকা মতে, শাকলের শিষ্যগণই বাস্কল বা আশ্বলায়ন শাখা রচনা করেছেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী বা যাস্কের নিরুক্তেও শাকল শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় যার দ্বারা শাকল শাখার প্রাচীনত্ব ও প্রধানতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে আমরা ঋগ্বেদ বলে যা জানি, তা মূলত এই বিশুদ্ধ ও প্রাচীন শাকল শাখার সংহিতা।
বাস্কল ও আশ্বলায়ন শাখাতেও এই সূক্ত ও মন্ত্রগুলো উপস্থিত। তবে বাস্কল ও আশ্বলায়ন শাখাতে এমন অনেক পৃথক মন্ত্র আছে যেগুলো তিন শাখার ভেতরে কমন না। অর্থাৎ, যেগুলো মূল ঋগ্বেদের অংশ নয়, বরং পরবর্তীতে ঐ ঐ শাখার সংহিতায় প্রবেশ করানো।

প্রথমত, কমন সোর্স বা সব শাখায় উপস্থিত না থাকা।

দ্বিতীয়ত, খিলের ভাষা, দেবতা, ছন্দ তুলনামূলক নবীন হয়।

■ যারা কিনা বলবেন না শাকলও আসলে শাখা হয়েও যেমন মান্য মূল হিসেবে তাহলে এগুলোও মান্য তাদের কাছে প্রশ্ন রইলো , উত্তর প্রমাণযুক্তিসহ দেবেন আশা করি -

১। যদি শাখাই হয় সব নানা লেখাতে ঋগ্বেদ না লিখে কেন ঋগ্বেদের শাকল শাখা লিখেন না কেন ?

২। আশ্বলায়ন শাখার মত অন্য শাখাতেও তো এক্সট্রা এমন সূক্ত বা মন্ত্র আছে । এখন সব শাখা তো পাওয়া যায় না । প্রায় ৯০% শাখাই হারিয়ে গিয়েছে । তারমানে কি বেদের অনেক মন্ত্র হারিয়ে গিয়েছে ? কেননা আপনার যুক্তি অনুযায়ী সব শাখাই বেদ হলে হারিয়ে যাওয়া শাখার মন্ত্রও নিশ্চয়ই বেদের বাইরে হবে না ।

উল্লেখ্য, ঋগ্বেদের ৫টি, সামবেদের ১০০০টি, যজুর্বেদের ১০০ শাখা, অথর্ববেদের ৯টি শাখার নাম পাওয়া যায় । এই নিয়েও মহাভাষ্যের সাথে চরণব্যূহের অমিল দেখা যায় । এখন, ঋগ্বেদের ৪টি, সামবেদের ৩টি, যজুর্বেদের ৩টি [মৈত্রেয়াণী, কাঠকসহ ৫টি] ও অথর্ববেদের ২টি শাখা এখন পাওয়া যায় ।

আগ্রহী পাঠকরা শাখা নিয়ে এই নিবন্ধটি পড়তে পারেন -

https://back2thevedas.blogspot.com/2021/12/blog-post_43.html?m=1

এবার আসা যাক আলোচ্য সূক্ত নিয়ে । আশ্বলায়ন শাখার সম্পাদক এই সূক্ত অর্থাৎ ৭ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তকে * দিয়ে আলাদা করে চিহ্নিত করে প্রথমেই দেখিয়েছেন যে এটি খিল ।
এই সূক্তের ঋষি মৈত্রাবরুণির্বৈশিষ্ট্য । ৮টি মন্ত্র আছে এই সূক্তে । যার ১মটির দেবতা সর্প ও ২-৮ এর দেবতা সর্পভয়বাধঃ । আলোচ্য মন্ত্রটি হলো -

কালি.কো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ ।
যমুনহ্রদে হ সো জাতো অসৌ নারায়ণবাহনঃ ॥
যদি কালি.কদূতস্য যদি কাঃকালি.কাদ্ ভয়ম্ ।
জন্মভূমিং পরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালি.কঃ ॥
ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখা ৭।৫৬।৪-৫

বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেছে বলে গর্ব প্রদর্শনকারী এই বিষয়টি অত্যন্ত সযতনে চেপে গিয়েছেন যে এই সংহিতার শেষেই অতিরিক্ত মন্ত্রগুলোর ইংরেজি ও হিন্দি অনুবাদ দেওয়াই আছে, যার সাথে তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যার বেশ গড়মিল । আমরা সেগুলো একটু দেখি -

৪র্থ মন্ত্রটির আশ্বলায়ন সংহিতার সম্পাদকদের অনুবাদ - The serpent, known as Kalika, the possessor of strength of a thousand young elephants: verily he is born in the Yamuna river. He is the carrier of Narayana.

(वह) काळिक नाम का सर्प नये सहस्र हाथियों के बल वाला है। वही यमुन सरोवर में पैदा हुआ है, वही नारायण का वाहन है।

অর্থাৎ, কালি.ক নামের সর্প নতুন সহস্র হাতির ন্যায় বলশালী । সে-ই যমুন সরোবরে জন্ম নিয়েছে, সে-ই নারায়ণের বাহন ।

তথাকথিত প্রথম বাংলা অনুবাদঃ যমুনার হ্রদে জন্মলাভ করা সহস্রহাতির ন্যায় বলশালী সেই কালিক নামক সর্প নারায়ণের বাহন।

সমীক্ষাঃ

১। এখানে কালি.ক [ল নয় কিন্তু ' ল.'] নাম লেখা । কালিয় নয় । ভাগবত অনুযায়ী কালিয় নাগ নাম । তাহলে পঞ্চমবেদ পুরাণ (?) ভাগবতের [১০।১৬।৪] নাম কী ভুল ? সঠিক নাম কোনটি ?

২। মূল মন্ত্র ও হিন্দি উভয় অনুবাদে ' যমুন ' হ্রদের কথা । ইংরেজিতে Yamuna River এবং হিন্দি অনুবাদের সাথে মেলালেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়া যাবে, এটাও এই মন্ত্রের সন্দিগ্ধতার একটি প্রমাণ । কেননা মূলে ' যমুন হ্রদ আছে '। বাংলার গর্বিত গর্হিত অনুবাদক মূল মন্ত্রের উপর চালাকি করে অনুবাদে ' যমুনা ' লিখেছেন । এটা কি অর্থ বিকৃতি নয় মহাশয় ?

৩। কালিয় নাগ বা কালিক নাগ যদি একই হয় তাহলেও তো কালিয় নাগ যমুনার হ্রদে জন্মগ্রহণ করেনি, বরং সে যমুনার পাশে হ্রদে থাকতো ও সেখান থেকেই তার বিষে নদীর জল বিষাক্ত হয়েছে [ভাগবত ১০।১৬।৪] ।

যমুনা মূলতঃ নদী । কোন হ্রদ না [১০।১৬।৬ -৭] । কোন অভিধানে উনি পেয়েছেন যে হ্রদ ও নদী এক ?

৪। নারায়ণের বাহন গরুড় [স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড সেতুমাহাত্ম্য ৩৭.৯০-৯৩] । কালিয় নাগ কবে থেকে নারায়ণের বাহন হওয়া শুরু করলো ?

৪র্থ মন্ত্রটির আশ্বলায়ন সংহিতার সম্পাদকদের অনুবাদ - - If there is a fear from the messenger of Kalika, if there is a fear from the Kähklika a particular type of serpent, moving in the area of the birthplace the Kalika becomes poisonless

यदि उस काळिक सर्प के दूत को का: कालिक (सर्प की एक विशेष जाति) से भय है तो (यह ठीक नहीं, क्योंकि) जन्मभूमि को पार करने पर वह काळिक विषरहित हो जाता है।

যদি সেই কালিক সর্পের দূতের কাঃকালিক [সর্পের এক বিশেষ জাতি] ভয় হয় তবে [তা ঠিক নয়, কেননা] জন্মভূমি অতিক্রম করলে কালিক বিষরহিত হয়ে যায় ।

তথাকথিত প্রথম বাংলা অনুবাদঃ যদি ঐ কালিক সর্পের দূত কাঃকালিক নামক সর্পের থেকে ভয় পায়, তাহলে জন্মভূমি অতিক্রম করে সেই কালিক সর্প বিষহীন হয়ে যায়।

- সমীক্ষাঃ এই মন্ত্রের অনুবাদ কি বুঝে দেওয়া হলো ? বোধহয় একটা মন্ত্র দিলে খারাপ দেখা যায় এজন্য । নতুবা এই যে কালিক সাপের দূতের কথা বলা এটা কোথায় আছে ? আর কালিয় সাপ নিজেই তো পুরাণ অনুযায়ী বহিরাগত ছিলো । তাহলে হিসেবে তার জন্মস্থান রমণক দ্বীপ থেকে গরুড়ের জন্য সরার কারণে তো যমুনায় তার বিষ থাকার কথা না । দেখুন ভাগবত ১০।১৭।১, ৮ ।

শুধু তাই নয় , ৮ম মন্ত্রে বলা হচ্ছে,

কর্কোটক নামের সাপ যাকে দেখা মাত্র বিষ ব্যাপ্ত হয় সেটিই সাপের সর্পত্ব , হে সর্প তোমাকে আমার নমস্কার ।

এবার কি প্রাকৃত সাপও পুজা করা শুরু করবেন হে মহানুভব ? চাইলে এমন খিল অংশ থেকে মজাদার বিষয় আরো দেখানো যায় ।

আশা করি সম্মানিত পাঠক বুঝতে পারছেন শাখার এসব মন্ত্রের প্রামাণিকতা কতটুকু ও পুরাণের সাথেই কতটা গড়মিল আছে । পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট যে অত্যন্ত সুচতুরভাবে অনুবাদ পালটে দিয়ে কেন বেদের নামে এসব মন্ত্র অনুপ্রবিষ্ট করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে । এতে লাভ -

১। নিজস্ব পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণের মাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়া ও মানুষকে বেদের নামে ভ্রান্ত করা ।

২। বিধর্মীদের এটা বলার সুযোগ করে দেওয়া যে অন্য শাখাতেও নানা মন্ত্র ছিলো । সেগুলো যেহেতু নেই তারমানে বেদ হারিয়ে গিয়েছে বা সনাতনীদের বেদ বিকৃত ।

আসুন, আমরা জানি - পড়ি , নিজে সচেতন হই এবং অন্যদেরও সচেতন করি ।

আধিভৌতিক-প্রক্রিয়ানুসারী বেদার্থ

কোনো তত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে অর্থদর্শনের বিবিধ শৈলী পরমাত্মা প্রদত্ত বেদার্থ দর্শনকারী পরম্পরার ঋষি-মুনি-মহর্ষিগণ দ্বারা স্বীকৃত। সৃষ্টির শুরু থেকেই বেদ মন্ত্রের অর্থ বিবিধ প্রক্রিয়ায় দর্শানো তথা ব্যাখ্যার প্রণালি বহমান। বৈদিক শব্দ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থের নির্দেশ করে তথা মন্ত্রের বিষয়বস্তু বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধ অভিব্যক্তি দর্শিয়ে থাকে।

উদাহরণার্থ, ইন্দ্র বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর, শরীরে জীবাত্মা, প্রাণ অথবা মন, প্রকৃতিতে সূর্য, বায়ু অথবা বিদ্যুৎ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা অথবা সেনাপতি, যজ্ঞে যজমান অথবা যজ্ঞাগ্নি। [1] এরূপভাবে বৈদিক অন্য দেবতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেদ স্বয়ং বর্ণনা করেছেন মনুষ্যের শরীর ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্ররূপ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেবতা এই মনুষ্য দেহতেই অবস্থিত - " সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইব শ্রিতাঃ "। [2]

অতঃ বেদমন্ত্র যেমনভাবে বাহ্য জগৎ পক্ষেও ঘটে থাকে, তদ্রূপ শরীরপরক পক্ষেও ঘটিত হয়।

বেদার্থের আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার অভিপ্রায় হলো বেদমন্ত্রের প্রাণী পরক বা ভূত অথবা সমাজশাস্ত্রোপযোগী এবং রাষ্ট্রপরক ব্যাখ্যা দর্শানো। বেদের প্রকট হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্তে, মানবজাতি এক সামাজিক প্রাণী। অতঃ মানবজাতির সাথে সম্বন্ধিত পরিবার, শিক্ষাসংস্থান, সমাজ, রাষ্ট্র আদির অভ্যুদয়ের বিবিধ উপায়ের বর্ণনও বেদ-এ বর্ণিত স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ বেদেই শিক্ষা, বিবাহ, পারিবারিক সাংমনস্য, রাজপ্রজাধর্ম, শত্রুবিজয়, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন আদির বিস্তৃত বর্ণন তথা উপদেশ-আদেশ বিদ্যমান, যা বিবিধ ভাষ্যকার যত্র-তত্র দর্শিয়েছেন। বেদমন্ত্রে এই বিষয়সমূহের এহেন ব্যাখ্যা করা বেদার্থের অধিভূত বা আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই আধিভৌতিক প্রক্রিয়া অনুসারে বৈদিক ইন্দ্র, অগ্নি আদি দেবকে রাজা, সেনাপতি, বৈদ্য, গৃহপতি, আচার্য আদি-রূপে ব্যাখ্যাত করা যায়।

যদ্যপি নিরুক্ত শাস্ত্রে উক্ত প্রক্রিয়ার নামতঃ উল্লেখ অনুপলব্ধ, তথাপি বিবিধ প্রকরণে এহেন ব্যাখ্যা দর্শানো হয়েছে যে, এই অধিভূত প্রক্রিয়ায় সেই ব্যাখ্যা সমূহ পরিগণিত হয়। নিরুক্তের দায়ভাগ-প্রকরণে (৩.১.২-৬) এ প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যথা-

শাসদ্ বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্ বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্য়ন্ ।
পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্ সং শগ্ম্যেন মনসা দধন্বে ॥ ”

[ঋগ্বেদ. ৩।৩১।১]

এই মন্ত্রের পূর্বার্দ্ধে নিরুক্তকার 'পুত্রের সমান পুত্রীও দায়ভাগের অধিকারিণী হয়ে থাকে', এই পক্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন, তথা নিম্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন-

“প্রশাস্তি বোঢা সন্তানকর্মণে দুহিতুঃ পুত্রভাবম্... নপ্তারম্ উপাগমদ্ দৌহিত্রং পৌত্রমিতি । বিদ্বান্ প্রজননয়জ্ঞস্য রেতসো বা অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভূতস্য হৃদয়াদধিজাতস্য মাতরি প্রত্যৃতস্য বিধানং পূজয়ন্ । অবিশেষণ মিথুনা পুত্রা দায়াদা ইতি ।”

অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ সন্তানকর্মের জন্য পুত্রীকে পুত্র-বৎ ঘোষিত করে এবং এরূপভাবে স্বীয় দৌহিত্রকে পৌত্রের ন্যায় গ্রহণ করে । যুক্তি এই দেওয়া হয় যে, পুত্র হোক অথবা পুত্রী, প্রজননযজ্ঞ উভয়ের প্রতিই সমান । পরন্তু বিপক্ষীর এই মত যে, মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট যে, উক্ত বিধান অভ্রাতৃকা কন্যার সম্বন্ধে, অর্থাৎ যে কন্যা ভ্রাতাবিহীন সেই কন্যাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করার শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে ।

প্রস্তুত মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র । অতঃ বহ্নি শব্দ ইন্দ্রের জন্য প্রযুক্ত, এই শৈলীতে উক্ত মন্ত্রের অধিদৈবত অর্থও দর্শানো যায় । পরন্তু উক্ত স্থলের দায়ভাগ-বিচারের মন্ত্রটির অর্থ নিরুক্তকার অধিভূত প্রক্রিয়া অনুসারেই দর্শিয়েছেন ।

অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ সন্তানকর্মের জন্য পুত্রীকে পুত্র-বৎ ঘোষিত করে এবং এরূপভাবে স্বীয় দৌহিত্রকে পৌত্রের ন্যায় গ্রহণ করে । যুক্তি এই দেওয়া হয় যে, পুত্র হোক অথবা পুত্রী, প্রজননযজ্ঞ উভয়ের প্রতিই সমান । পরন্তু বিপক্ষীর এই মত যে, মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট যে, উক্ত বিধান অভ্রাতৃকা কন্যার সম্বন্ধে, অর্থাৎ যে কন্যা ভ্রাতাবিহীন সেই কন্যাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করার শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে ।

“ য়ঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্, সর্বেভ্যোঽন্তরো, য়ং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং, য়ঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো য়ময়তি স ত আত্মাঽন্তর্য়াম্যমৃত ইত্যু এবাধিভূতম্ । ”

[শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৪।৬।৭।২০]

উক্ত বর্ণন দ্বারা স্পষ্ট যে, কোনো তত্ত্বকে অন্য দৃষ্টির সাথে অধিভূত দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যা করার পরম্পরা শতপথ ব্রাহ্মণের সময়েও বিদ্যমান ছিলো । 'ভূতানি' পদ দ্বারা এ স্থলে প্রাণিবর্গই অভিপ্রেত হয়েছে, যদ্যপি ভূত শব্দের অর্থ উৎপন্ন সমস্ত জড়-চেতন পদার্থও নির্দেশ করা হয়ে থাকে । যদি এ স্থলে 'ভূতানি' পদ দ্বারা সমস্ত জড়-চেতন পদার্থ গ্রহণ করা হতো, তবে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য আদি দেব, সমস্ত লোক, বেদ আদির পৃথক্ চর্চা অনাবশ্যক ছিলো, কেননা উৎপন্ন জড়-চেতন পদার্থসমূহে এই প্রকরণগুলোও গণনা করা হতো । অতএব শাস্ত্রের বিবিধ স্থলে এহেন প্রাণিপরক প্রক্রিয়াকে অধিভূত বা আধিভৌতিক প্রক্রিয়া নামে সংজ্ঞায়িত করা

হয়েছে । অধিভূত প্রক্রিয়ায় তৎসদৃশ অর্থই পরিগণিত হবে যা, কোনো দেহধারী প্রাণী, বিশেষতঃ মনুষ্যবর্গ তথা পরিবার, সংঘ, সমাজ, রাষ্ট্র আদিতে সম্বন্ধ রাখে ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে "অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই প্রকরণে অধিলোক, অধিজ্যৌতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ্ঞ তথা অধ্যাত্ম পঞ্চবিধ ব্যাখ্যা দর্শানো হয়েছে, এখানে অধিবিদ্য তথা অধিপ্রজ্ঞ ব্যাখ্যা অধিভূত ব্যাখ্যার অন্তর্গত -

" আচার্যঃ পূর্বরূপম্ অন্তেবাসী উত্তররূপম্,
বিদ্যা সন্ধিঃ, প্রবচনং সন্ধানম্, ইত্যধিবিদ্যম্।
অথাধিপ্রজম্ – মাতা পূর্বরূপং, পিতা উত্তররূপং
প্রজা সন্ধিঃ প্রজননং সন্ধানম্॥
[তৈত্তিরীয় আ. ৭।৩, তৈ.উ.শিক্ষাবল্লী.৩]

বেদ মন্ত্রের অধিভূত ব্যাখ্যায় বৈদিক দেবগণের স্বরূপ সামাজিকভাবে কীরূপ, তা স্বয়ং বেদেই ব্যাখ্যাত হয়েছে । উদাহরণার্থ বেদ-এ 'অগ্নি'-কে রাজা, নৃপতি, বিশ্পতি, শত্রুসেনামোহক, পুরোহিত, গৃহপতি, পিতা, ভিষক্ আদি শব্দে নির্দেশিত হয়েছে ।

যথা—

(ক) বৈশ্বানর ত্বমস্মাসু ধেহি বসূনি
রাজন্ৎস্পৃহয়ায়্যাণি ।
[ঋগ্বেদ. ৬।৭।৩]

(খ) ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে।
[ঋগ্বেদ. ২।১৬]

(গ) বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে ।
[ঋগ্বেদ. ১।১২৬।৮]

(ঘ) স সেনাং মোহয়তু পরেষাম্ ।
[ঋগ্বেদ. ৩।১।১]

(ঙ) অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।
[ঋগ্বেদ. ১।১।১]

(চ) বিশ্বাসাং গৃহপতির্বিশামসি ত্বমগ্নে মানুষীণাম্ ।
[ঋগ্বেদ. ৬.৪৮.৮]

(ছ) অগ্নিং মন্যে পিতরম্ ।
[ঋগ্বেদ. ১০.৭.৩]

(জ) ত্বং ভিষগ্ ভেষজস্যাসি কর্তা।
[অথর্ববেদ. ৫।২৯।১]

● ইন্দ্র মনুষ্যের সম্রাট্, রাজাধিরাজ, স্বরাজ্যের আরাধক, আর্যকে ভূমি প্রদাতা, জ্যেষ্ঠ শত্রুহন্তা আদি শব্দে বেদ মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে –

(ক) প্র সম্রাজং চর্ষণীনাম্ ।
[ঋগ্বেদ. ৮।১৬।১]

(খ) ইন্দ্রো জয়াতি ন পরাজয়াতা অধিরাজো
রাজসু রাজয়াতৈ।
[অথর্ববেদ. ৬।৯৮।১]

(গ) অর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ।
[ঋগ্বেদ. ১।৮০।১-১৬]

(ঘ) অহং ভূমিমদদামার্যায় ।
[ঋগ্বেদ. ৪।২৬।২]

(ঙ) বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো য়ো
বৃত্রহা গৃণে ।
[ঋগ্বেদ. ৮।৭০।১]

● রুদ্র ভিষগ্‌রাজ, স্থিরধন্বা এবং তীব্রগামী ধনুকধারী সেনাপতি আদি শব্দে বেদ মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে –

(ক) ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি ।
[ঋগ্বেদ. ২।৩৩।৪]
(খ) ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাবেন ।
[ঋগ্বেদ. ৭.৪৬.১

● মরুৎ-কে মহান বীর সৈনিক বলা হয়েছে, তার নিকট রিপু-দলকে পরাস্ত করার জন্য সুদৃঢ় হাতিয়ার রয়েছে এবং যার সৈন্য-বল প্রশংসার যোগ্য –

" স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ "
[ঋগ্বেদ. ১।৩৯।২]

এরূপভাবে বৈদিক দেবের অধিভূত ব্যাখ্যা বেদ-এ বর্ণন হয়েছে । অবৈদিক সায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক ভাষ্যকারগণের ভাষ্যে উক্ত প্রক্রিয়ার কোনোরূপ ছিটেফোঁটাও অনুপস্থিত । তথাপি কোনো কোনো ভাষ্যে কিঞ্চিৎ নির্দেশ উপস্থিত, যথা – অথর্ববেদ. ৪।৮।৩ নং ' মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ' মন্ত্রের 'বৃষ্ণো' পদের স্থলে 'বিষ্ণোঃ ' পাঠ মেনে অবৈদিক সায়ণ বিষ্ণু শব্দের অর্থ 'রাজকীয় তেজ দ্বারা দশ দিশাতে ব্যাপ্ত রাজা' ব্যাখ্যা করেছে । [3]

ব্রাহ্মণ বাঙ্ময়েও যজ্ঞবিধি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকরণে বৈদিক দেবগণের মানবীয়রূপ নির্দেশ করা হয়েছে।

যথা- ব্রাহ্মণ অগ্নি, পুরুষ অগ্নি, যজমান অগ্নি, যজমান ইন্দ্র, ক্ষত্রিয় ইন্দ্র, সেনা ইন্দ্রের প্রিয় জায়া, পুরোহিত আদিত্য, ব্রাহ্মণ আদিত্য, বিদ্বান্‌গণ গ্রাবা, ক্ষত্রিয় রাজা যম, প্রজাগণ পিতর আদি ।

অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণঃ
[কাঠক. ৬।৬]
পুরুষ এবাগ্নির্বৈশ্বানরঃ
[জৈমিনীয় ব্রা. ১।৪৫]
পুরুষো বাগ্নিঃ
[শতপথ ব্রা. ১৪।৯।১।১৫]
য়জমানোঽগ্নিঃ
[শতপথ ব্রা. ৬।৩।২১]
ইন্দ্রো বৈ য়জমানঃ
[শতপথ ব্রা. ২।১।২।১১]
ক্ষত্রং বা ইন্দ্রঃ
[শতপথ ব্রা. ৫।৩।৫।৩৩]
সেনা বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া জায়া
[ঐতরেয় ব্রা. ৩।২২]
আদিত্যো বাব পুরোহিতঃ
[ঐতরেয় ব্রা. ৮।২৭]
এতে খলু বাদিত্যা য়দ্ ব্রাহ্মণাঃ
[তৈত্তিরীয় ব্রা. ১।৯।৮]
বিদ্বাংসো হি গ্রাবাণঃ
[শতপথ ব্রা. ৩।৯।৩।৪]
ক্ষত্রং বৈ য়মো বিশঃ পিতরঃ
[শতপথ ব্রা. ৭।১।১।৪]

এরূপ ভাবে মন্ত্রের অতি প্রাচীন বিনিয়োগ পদ্ধতি দ্বারাও বৈদিক দেবগণের মানবীয় রূপ নির্ণয় করা যায় ।

যথা –
ঋগ্বেদীয় এবং অথর্ববেদীয় সোম-সূর্যা-সূক্তের মন্ত্রসমূহ বিবাহ-বিধিতে বিনিয়োগ হওয়ায় সোম বর তথা সূর্যা বধূ, অতএব নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা বধূকে রথে আহরণ করানো হয় । [4]

“ সুকিংশুকং বহতুং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্ ।
আরোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পতিভ্যো বহতুং কৃণু ত্বম্ ॥
রুক্মপ্রস্তরণং বহ্যং বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতম্ ।
আরোহৎ সূর্যা সাবিত্রী বৃহতে সৌভগায় কম্॥”
[অথর্ববেদ. ১৪।১।৬১ ; ১৪।২।৩০]

অথর্ববেদ. ২।১৩।২ “ বৃহস্পতিঃ প্রায়চ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ ” এই মন্ত্রের মাধ্যমে পুরোহিত দ্বারা রাজাকে বস্ত্র [5] ধারণ করানোর বর্ণনাকে নির্দেশ করছে যে, এই মন্ত্রের অধিভূত ব্যাখ্যায় পুরোহিত বৃহস্পতি তথা রাজা সোম অর্থে প্রয়োগ হবে ।

অধিভূত প্রক্রিয়াকে পল্লবিত, পুষ্পিত এবং ফলিত ভাবে দর্শিয়েছেন বর্তমান যুগের মহা মনীষী ভাষ্যকার, সর্ব শাস্ত্রের অদ্বিতীয় বিদ্বান্ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ জী সরস্বতী । এই আধিভৌতিক প্রক্রিয়া বেদ ভাষ্যে তিনি ব্যাবহারিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।

– ’অলমতিবিস্তরেণ বিদ্বদ্বর্য্যেষু’

- **সন্দর্ভ**

1. য় ইন্দতি পরমৈশ্বর্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ, ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়স্বামিনো জীবস্য, দয়ানন্দ ভাষ্য, যজু. ১৯।৩ ; ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ, সায়ণ. ঋগ্ ভাষ্য. ১০।৯২।৮, ১০।৯৮।৪ । প্রাণ এব ইন্দ্রঃ, শতপথ. ১২।৯।১।১৪ । মন এবেন্দ্রঃ, শতপথ. ১০।৪।১।৬ । অথ য়ঃ স ইন্দ্রোঽসৌ স আদিত্যঃ, শতপথ. ৮।৫।৩।২ । অয়ং বা ইন্দ্রো য়োঽয়ং বাতঃ পবতে, শতপথ. ১৪।২।২।৬ । য়ো বৈ বায়ুঃ স ইন্দ্রো য় ইন্দ্রঃ স বায়ুঃ, শতপথ. ৪।১।৩।১৯ । ইন্দ্রাৎ বিদ্যুতঃ, দয়ানন্দ ভাষ্য. ঋগ্. ৫।৩০।৫ । ত্বমিন্দ্রাধিরাজঃ অথর্ববেদ. ৬।৯৮।২ । ইন্দ্র শত্রূণাং বিদারয়িতঃ (সেনাপতে) দয়ানন্দ ভাষ্য. ঋগ্. ১।৮৪।৪ । ইন্দ্রো য়জমানঃ, কাঠক. ৭।১০, ৩৭।৮ । এষ এবেন্দ্রঃ য়দাহবনীয়ঃ শতপথ. ২।৩।২।২

2. অথর্ববেদ. ১১।৮।২৯-৩২ ; তুলনা- ঐতরেয় উপ. ২।৪ ; ছান্দোগ্য উপ. ৮।১।৩

3. বিষ্ণোঃ অভিষেকজনিতরাজতেজসা দশদিগন্তান্ ব্যাপ্নুবতঃ । সায়ণ

4. সুকিংশুকং রুক্মপ্রস্তরণমিতি য়ানমারোহয়তি । [কৌশিক সূত্র. ৭৭।১]

5. পরিধত্তেতি দ্বাভ্যাং রাজ্ঞো বস্ত্রমভিমন্ত্র্য প্রয়চ্ছেদ্ । [অ. প. ৪।১।১]

সামবেদ কি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট ?

সামবেদ একটি মৌলিক বেদ এবং বেদের প্রতিটি মন্ত্রই মৌলিক। কোনো বেদের কোনো মন্ত্র অপর বেদ থেকে সংগৃহীত বা পুনরুক্তি হয়নি। কিন্তু দেখা যায়, সামবেদে কিছু মন্ত্র রয়েছে যেগুলো হুবহু অন্য বেদেও পাওয়া যায়। এ থেকে মনে শঙ্কা আসতে পারে সামবেদ কি পুনরুক্ত দোষে দুষ্ট ? এই শঙ্কার সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে পুনরুক্তের পরিভাষা জানতে হবে। পুনরুক্তের পরিভাষা নির্দেশ করার সময় ন্যায়দর্শন ২।১।৬১ সূত্রের ভাষ্যে ঋষি বাৎস্যায়ন বলেছেন -

'অনর্থকোঽভ্যাসঃ পুনরুক্তম্' অর্থাৎ অনর্থক অভ্যাসকে পুনরুক্ত বলা হয়। 'শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ।' (ন্যা০ দ০ ৫।২।১৪) অর্থাৎ অনুবাদ ব্যতীত শব্দ ও অর্থের পুনর্বচন হল পুনরুক্ত।

বেদ পরমেশ্বর প্রদত্ত। বেদমন্ত্র মাত্রই সার্থক। তাই বেদে পুনরাবৃত্ত মন্ত্র বা মন্ত্র চরণ আদিকে পুনরুক্ত বলা হয় না। বরং এগুলোকে অনুবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কেননা -

'অনুবাদোপপত্তেঃ চ।' (ন্যা০ দ০ ২।১।৬১) অর্থাৎ সার্থক আবৃত্তি হলো অনুবাদ। ঋষি বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন —

'অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ' অর্থাৎ অর্থবান অভ্যাসকে অনুবাদ বলা হয়। অনুবাদ কিসের হয় তা নির্ণয়ে ঋষি গৌতম বলেছেন- 'বিধিবিহিতস্য অনুবচনং অনুবাদঃ।' (ন্যা০ দ০ ২।১।৬৬) অর্থাৎ কর্মের বিধির যে বিধান করা হয়েছে তার যে অনুবচন = পরবর্তী বচন তাকে অনুবাদ বলা হয়। এই অনুবচন ও অনুবাদ দুই প্রকারের। এই বিষয়ে ন্যায়দর্শন ২।১।৬৮ ভাষ্যে ঋষি বাৎস্যায়ন বলেছেন- 'বিধ্যনুবচনং চানুবাদো বিহিতানুবচনং চ' অর্থাৎ অনুবাদ মূলত বিধি অনুবচন (শব্দানুবাদ) ও বিহিত অনুবচন (অর্থানুবাদ) এই দুই প্রকার।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এই অনুবাদের প্রয়োজন কি?

অনুবাদের প্রয়োজন স্পষ্ট করার জন্য ঋষি গৌতম বলেছেন-

"শীঘ্রতরগমনোপদেশবতভ্যাসাত্ন অবিশেষঃ।" (ন্যা০ দ০ ২।১।৬৮) অর্থাৎ অতি শীঘ্র গমনের উপদেশের ন্যায় আবৃত্তি হওয়াতে অনুবাদে ও পুনরুক্তে ভেদ রয়েছে। "অনুবাদেত্ব পুনরুক্তমর্থবিশেষোপপত্তেঃ।" (ন্যা০ দ০ ৫।২।১৫) অর্থাৎ অনুবাদে নিশ্চিত রূপে বিশেষ অর্থ পাওয়া যাওয়াতে তা পুনরুক্ত হয় না।

সহজভাবে বললে, বারংবার আবৃত্তিতে যদি কোনো অর্থ পাওয়া না যায় তবে তাকে পুনরুক্ত বলে। আর যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে সেটিকে অনুবাদ বলা হয়। বেদের প্রতিটি মন্ত্র সার্থক। ফলে একই মন্ত্রের কয়েকবার আবৃত্তি হলেও সেটিকে পুনরুক্ত নয়, বরং অনুবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই অনুবাদের মাধ্যমে মূলত কর্মের বিধির বিধান প্রদান করা হয়৷ পূর্বের অনুরূপ মন্ত্রে যে বিধি প্রদান করা হয়নি তা এই মন্ত্রের আবৃত্তিতে প্রদান করায় এই অনুবাদ সার্থক। আর মূল কথা হলো অনুবাদে বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়। যার ফলে বেদার্থের পরিধি বৃদ্ধি পায় ও বেদজ্ঞান বিস্তৃত হয়।

এক্ষেত্রে যজুর্বেদের একটি মন্ত্রের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বিষয়ে সহজে বোঝানো যাবে।

উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি ।
ঘৃতং ঘৃতয়োনে পিব প্রপ্র য়জ্ঞপতিং তির স্বাহা ॥
এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের ৫ম অধ্যায়ের ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক মন্ত্র।

এখানে যজু ৫।৩৮ মন্ত্রটির তাৎপর্য হলো– ব্যাপক পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, তিনি সর্বব্যাপক হয়ে যেন আমাদের নিবাসের জন্য সামর্থ্য দান করেন ও শিক্ষিত বিদ্বানগণ যেন নিজেকে বারংবার প্রদীপ্ত করেন। যেভাবে ঋত্বিক যজমানের দুঃখ দূর করেন, সেভাবেই স্বাহা শব্দ কথনের মাধ্যমে অধ্যাত্ম আদি ত্রিবিধ যজ্ঞকে পূর্ণ করেন।

আবার এই মন্ত্রটিকেই যজু ৫।৪১ মন্ত্রে আবৃত্তি করে যজ্ঞীয় কর্মে সংলগ্ন হওয়ার জন্য প্রেরিত করা হয়েছে। যেভাবে লোকসমাজে প্রেরণা দানের জন্য 'পচতু পচতু ভবান্' = পক্ক করো পক্ক করো এই অনুবাদ=অভ্যাসপূর্বক প্রেরণা দেওয়া হয়। এই অনুবাদ প্রেরণার ৩ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে -

ক্ষিপ্রং পচ্যতাম্ = শীঘ্র পক্ক করো
অঙ্গ পচ্যতাম্ = প্রিয় পক্ক করো
পচ্যতামেব = অবশ্যই পক্ক করো

এর সাথে তুলনা করে আমরা প্রথমবার মন্ত্রের মধ্যে অনুবাদের ৩টি প্রয়োজন পেয়ে থাকি -

১. কর্মে শীঘ্রতা
২. কর্মের প্রক্রিয়ায় সংলগ্নতা
৩. কর্মের অনিবার্যতা

একেই যজু০ ৫।৪১ এ আবার পুনরাবৃত্তি করে নিম্নলিখিত প্রয়োজন সাধিত হয়েছে -

১. শিক্ষায় শীঘ্রতা
২. পরোপকার ক্রিয়ায় সংলগ্নতা
৩. যজ্ঞীয় কর্মসমূহের অনিবার্যতা

তাই, সামবেদ তথা সম্পূর্ণ বেদ পুনরুক্তি দোষ মুক্ত।

প্রকৃত যোগীর লক্ষণ কী ?

১. সর্বক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখা ।

২. সমস্ত সংসারে (নিজের শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে) নির্মাতা, রক্ষক ঈশ্বরকে মানা ।

৩. বেদ এবং বেদানুকূল ঋষিকৃত গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা ।

৪. ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি (ত্রৈতবাদের) স্বরূপকে যথার্থ রূপে জানা ।

৫. সংসারের বিষয় ভোগে চার প্রকারের দুঃখ [রোগ, হতাশা, একাকীত্ব এবং অসন্তুষ্টি] ও ত্রিবিধ দুঃখের অনুভব করা ।

৬. বিষয় ভোগের সুখ না নেওয়া, নিজের মন - ইন্দ্রিয়ের উপর অধিকারী হওয়া ।

৭. ঈশ্বরের দেওয়া সাধনকে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে (ধর্মপূর্বক) সাধক রূপে উচিত মাত্রায় ব্যবহার করা ।

৮. ফলের আশা না করে তিন এষণাকে ত্যাগ (পুত্রেষণা, লোকেষণা, বৃত্তেষণা) করে নিষ্কাম ভাবনায় কর্ম করা ।

৯. ইচ্ছা পূরণ না হলে, অপমান, অসফলতা, দুঃখ আসিলে, ইত্যাদি পরিস্থিতিতে চিন্তিত, ভয়ভীত, ক্ষোভযুক্ত, দুঃখী না হওয়া ।

১০. সমস্ত সংসার ঈশ্বরে ব্যপ্ত আছে এই রকম অনুভব করা ।

১১. দৈনন্দিন কাজ কর্ম ও ব্যবহারের সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা ।

১২. আধ্যাত্মিক অবিদ্যা (অনিত্য-অশুচি ইত্যাদি) হতে মুক্ত থাকা এবং বিদ্যাযুক্ত হওয়া।

১৩. সমস্ত অবিদ্যা যুক্ত সংস্কারকে দমিয়ে রাখতে সক্ষম হওয়া ।

১৪. মৃত্যু সামনে আসলেও যেন অষ্টাঙ্গযোগের যমরূপী মহাব্রত পালনে বিরত না হওয়া ।

১৫. প্রত্যেক সময় প্রসন্ন, সন্তুষ্ট, নির্ভয়, উৎসাহী, পুরুষার্থী এবং আশাবাদী হতে চেষ্টা করা ।

১৬. শরীর, বল, বিদ্যাকে এষণার জন্য প্রদর্শন না করা ।

১৭. অসত্যের ত্যাগ এবং সত্য গ্রহণ করা ।

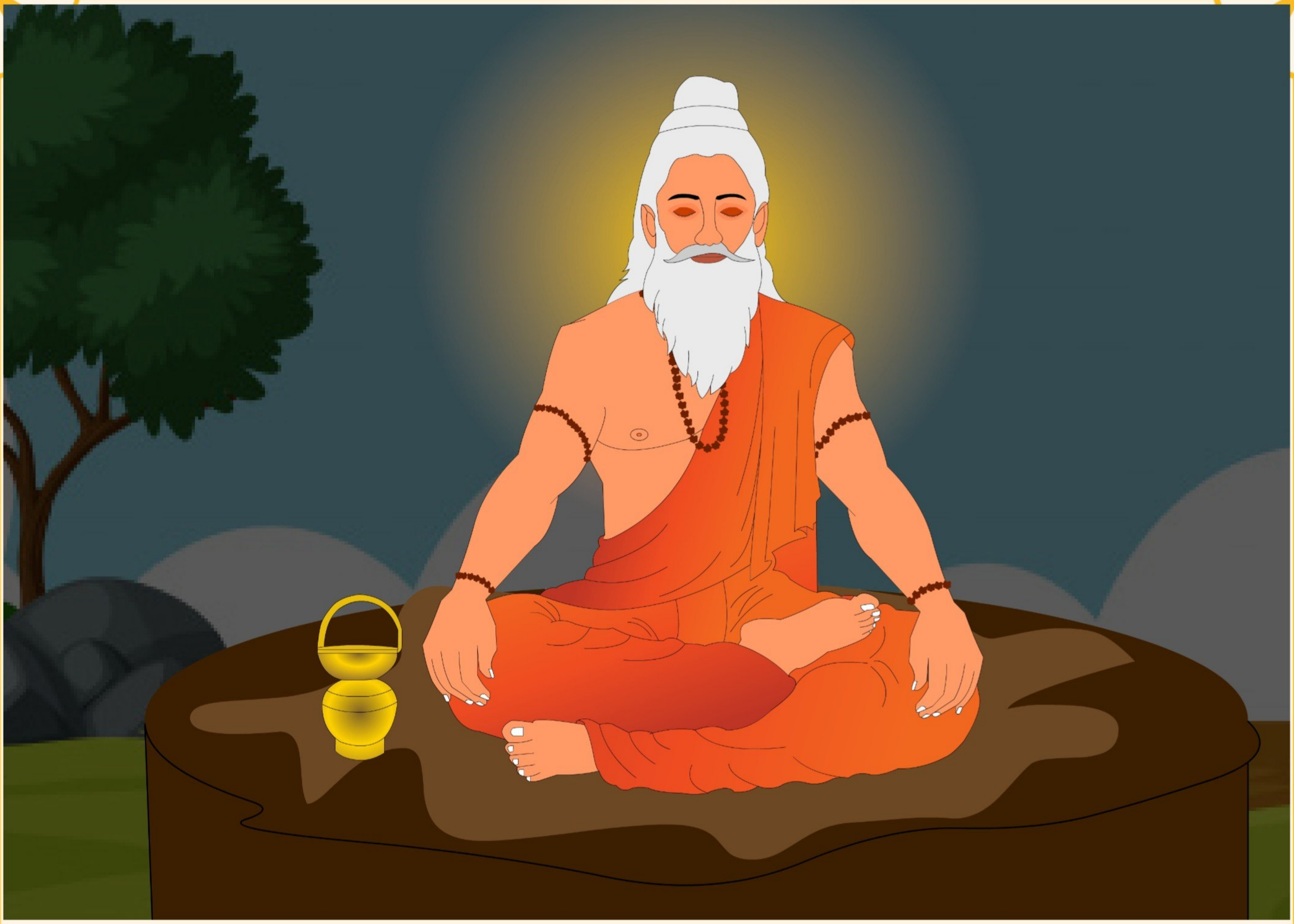

১৮. ধন, বল কীর্তি ইত্যাদি প্রাপ্তির লোভে আদর্শের ত্যাগ বা তার সাথে কখনো সমঝোতা না করা।

১৯. শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ কর্ম, শুদ্ধ উপাসনা এই তিনের সমায়োজন করে চলা।

২০. গম্ভীর, মৌন,একান্তসেবী, সংযমী, তপস্বী হওয়া । (বিশেষ করে প্রথম অবস্থায়)।

২১. দেশ, জাতি, প্রান্ত, ভাষা, মতপথ, রূপ-রং, লিঙ্গ, ইত্যাদির ভেদাভেদ না করে সবাইকে ভালবাসা, সকলের হিতৈষী, দয়ালু, কল্যাণকারী হওয়া ।

২২. যোগদর্শন, উপনিষদ্ বা অন্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থের সত্য সিদ্ধান্তকে ঠিক-ঠিক জেনে তার আচরণ করা ।

যজ্ঞোপবীতের মহত্ত্ব

ড. ভবানীলাল ভারতীয়

প্রতিটি সংস্কৃতিতে শরীর, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার শুদ্ধি তথা বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সংস্কারের বিধান করা হয় । জগতের একমাত্র নিত্য ধর্ম , পুরাতাত্ত্বিক বিচারে সর্ব প্রাচীন এবং সুসংস্কৃত সনাতন ধর্ম নিজের প্রতিটি সদস্যের জন্য যেই সংস্কারগুলোর ব্যবস্থা করছে , তার মধ্যে যজ্ঞোপবীতের বিশেষ মহত্ত্ব রয়েছে । মানুষ্যযোনী অন্য প্রাণীদের থেকে শ্রেষ্ঠ মানা হয় কারণ কর্তব্য তথা ধর্মের প্রতি মানুষের মধ্যে যেমন উত্তরদায়িত্বের ভাবনা জাগ্রত হয় তেমনটা অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। সংসারে জন্ম নিয়েই মানুষ অনেক ঋণে আবদ্ধ হয় ।

তাঁর প্রথম ঋণ জন্মদাতা মাতা পিতার নিকট যাঁরা তাকে জন্ম দিয়েছে, যজ্ঞোপবতীতের প্রথম সূত্র ধারণকর্তাকে 'পিতৃঋণ'এর কথা সর্বদা স্মরণ করায় । যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করার সময়ে আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে যেই মাতা-পিতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন আমরা তাদের সেবা করে তথা তাদের বলা আদর্শের উপর চলবো।

যজ্ঞোপবীতের দ্বিতীয় সূত্র 'আচার্যঋণ' থেকে মুক্ত হওয়ার সূচনা প্রদান করে। যদিও আমাদের স্থুল শরীর আমাদের পিতা-মাতা দ্বারা প্রদত্ত, তবুও যে আচার্যের চরণের নিকট বসে আমরা বিদ্যাভ্যাস করেছি, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের বৃদ্ধি করেছি তথা বিভিন্ন শাস্ত্রগুলোর জ্ঞানলাভ করেছি , সেই আচার্যের কাছে ঋণমুক্ত হওয়াটাও আমাদের কর্তব্য। সনাতন সংস্কৃতিতে আচার্যকে সর্বদা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে । ভগবান রাম যদি মহর্ষি বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মতো গুরুদের নির্দেশনা লাভ না করতেন তাহলে আমাদের জন্য তারা কী শিক্ষা স্থাপন করতেন ?

একইভাবে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গুরু আচার্য সান্দীপনি, আর্য সাম্রাজ্যের সংস্থাপক সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু আচার্য চাণক্য তথা হিন্দুপদপাদশাহীর আদর্শ বাস্তবায়নকারী শিবাজী মহারাজের গুরু সমর্থ স্বামী রামদাসের মতো আচার্যরা বৈদিক আর্য সংস্কৃতিকে সর্বদা বাঁচিয়ে রেখেছেন ।

এই যুগের মহান্ যুগপুরুষ স্বামী দয়ানন্দ তিনি তাঁর আচার্য দণ্ডী বিরজানন্দের ঋণ থেকে ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য নিজের জীবনকে আহুতি দিয়ে দিয়েছন এবং ধর্ম, সমাজ তথা রাষ্ট্রে এক অনন্য বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন । যজ্ঞোপবীতের তৃতীয় সূত্র সেই প্রাচীন ঋষিদের থেকে ঋণমুক্ত হওয়ার সংকেত প্রদান করে, যারা বেদ মন্ত্রের নিহিত তত্ত্বসমূহকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎকার করেছিলো এবং যারা ধর্মের স্বরূপকে জানতেন । জগতের কল্যাণের জন্য পরমাত্মা দ্বারা প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানকে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছানোর কাজ শুধুমাত্র এই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই করেছিলেন । গৌতম, কপিল, কণাদ, ব্যাস, জৈমিনি, পতঞ্জলি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, অত্রি, নারদ ইত্যাদি সহস্র ঋষিরা মানুষ জাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞানের যে প্রখর জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তা আজ পর্যন্ত প্রজ্বলিত করে রাখা এবং তা ভবিষ্যতেও একইভাবে উদীপ্ত রাখার জন্য যখন যজ্ঞোপবীতধারী ব্রক্ষচারী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তখন ঋষি ঋণ থেকে ঋণমুক্ত হওয়ারই বিনীত প্রচেষ্টা করে।

বৈদিক সামাজিক ব্যবস্থাতে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে দ্বিজ বলা হয়েছে । এটির অভিপ্রায় হলো এই যে যদি মানুষের একটি জন্ম তার মাতার গর্ভে হয় তাহলে নিজের আচার্যের সমীপে উপস্থিত হয়ে তথা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে নতুন জন্ম লাভ করে । এই সংস্কারের পরেই সে দ্বিজের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ।

কিন্তু এটির অর্থ এই নয় যে শুধু এই তিন বর্ণের সন্তানদেরই যজ্ঞোপবীত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। অধিকার তো সকলের আছে কেননা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করার পরেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হতো । মধ্যকালে যজ্ঞোপবীতের প্রচলন সমাজের কিছু ব্যক্তিবর্গ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । কিছু জাতি তো বিবাহের একদিন আগে যজ্ঞোপবীতের বিধান সম্পাদিত করতে শুরু করে দেয়, যেখানে যজ্ঞোপবীত এবং বেদারম্ভ দুইটি সংস্কার যুগপৎ অর্থাৎ একের পর অন্যটি হওয়া উচিত । স্ত্রী এবং শূদ্র যজ্ঞোপবীতের জন্য অনধিকারী বিবেচিত হয়, যেখানে প্রাচীন ইতিহাস [https://www.agniveerbangla.org/2018/02/blog-post_3.html] দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে সেই যুগে নারীরাও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতেন । প্রয়োজনীয় কথা হলো এটি যে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতীক যজ্ঞোপবীতের পুনঃপ্রচার হোক, যেনো আমরা নিজের সর্ববিধ উন্নতির প্রতি সচেতন হয়ে আর্যোচিত কর্তব্য কর্মের পালন করতে পারি। যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে প্রাচীন কর্মকাণ্ডীয় গ্রন্থ পারস্কর গৃহ্যসূত্রে যে বাক্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ—

ওতম্ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎস হজং পুরস্তাৎ । আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ । যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি ।

[পার০ গৃ০ ২।২।১১]

ভাবার্থঃ পরমপবিত্র নির্মল যজ্ঞোপবীত পরমাত্মার সহোৎপন্ন, আয়ু, তেজ ও বল প্রদান করে । তুমি যজ্ঞোপবীত, তোমাকে ধারণ করছি ।

এখানে, যজ্ঞোপবীতকে পরম পবিত্র বলা হয়েছে। যার মানে হলো এটি সকলের জন্য অবশ্যই ধারণ করার যোগ্য । নিজ-কর্তব্যের প্রতি প্রেরণাদানকারী হওয়ার কারণে একে পবিত্র মনে করাটাই উচিত । বস্তুতঃ এই যজ্ঞোপবীতকে প্রজাপতি ব্রহ্মাই উৎপন্ন করেছেন । অভিপ্রায় হলো, মানুষকে তাদের কর্তব্য পালনের উপদেশ স্বয়ং পরমাত্মাই দিয়েছেন এবং যজ্ঞোপবীতের এই তিনটি সূত্র একজন ব্যক্তির পিতৃ, আচার্য তথা ঋষি ঋণ হতে ঋণমুক্ত হওয়ারই প্রতীক । এটি শুভ্র, স্বচ্ছ এবং পবিত্র; যজ্ঞোপবীত ধারণকারীর আয়ু, বল তথা তেজকে বৃদ্ধি করে । পুনঃ প্রতিজ্ঞা করে, যজ্ঞোপবীত গ্রহণকারী বলছে যে - আমি তোমাকে (যজ্ঞোপবীতকে) যজ্ঞের মর্যাদার পালন করার জন্য, যজ্ঞ করার জন্য প্রতীকী রূপে ধারণ করতেছি ।

উপরে উল্লেখিত বাক্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এই সূত্র ধারণকারীকে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে যেনো তাঁর জীবন পবিত্র হয়ে উঠে । তাঁর, মন, কথায়, কাজে এক হোক তথা সকল প্রকারের অপকর্ম থেকে বিরত হোক । যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শুরুতেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন তিনি প্রথম আশ্রমেই তাঁর পুরো সময় বেদাদি শাস্ত্র পঠন, পাঠন, শ্রবণ, মনন এবং চিন্তনে ব্যয় করেন, পরবর্তীতে তাঁর গৃহস্থ জীবনও সংযম এবং আর্যোচিত জীবন আদর্শে পরিপূর্ণ হয় । এমন সংযমশীল ব্যক্তি তাঁর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক তথা আত্মিক বলের বিশেষ বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রযত্নশীল থাকে । তাই তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রাপ্তি হয় এবং তৃতীয় বানপ্রস্থ আশ্রমেও তিনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সময় নেওয়া প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয় জনকল্যাণে তথা জনশিক্ষায় ।

কিন্তু যখন তিনি জগতের সকল বন্ধন এবং আসক্তিকে ত্যাগ করে পূর্ণ বৈরাগ্যবোধ তথা সকলের কল্যাণ এবং হিত-চিন্তনের ভাবনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তাঁর এই বাহ্য প্রতীকের প্রয়োজন পড়ে না । এই অবস্থায় তিনি শিখা এবং পৈতা বিসর্জন করেন । যজ্ঞোপবীত সম্পর্কিত কিছু নিয়ম পালনযোগ্য নিম্নরূপ:-

১. যে ব্যক্তি নিজেকে আর্য ও দ্বিজ বলে মনে করে তাঁর অবশ্যই এই পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত । বৈদিক শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধান আমাদের জন্য মানা বাধ্যতামূলক । যজ্ঞোপবীত তো আমাদের কর্তব্যসমূহেরেই প্রতীক, আর্য সংস্কৃতিরও চিহ্ন । যজ্ঞোপবীত রক্ষার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক ত্যাগ এবং বলিদান স্বীকার করেছিলেন ।

২. সকল মানুষকে একটি-সময়ে তিন সূত্রের একটি যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হয় । বহু মানুষ ছয় সূত্রের যজ্ঞোপবীতকে ধারণ করে, এটি শাস্ত্রের আদেশের বিপরীত । কিছু মানুষের ধারণা হলো তাঁরা নিজের পত্নীর পরিবর্তে নিজেরা ছয় সূত্রের পৈতা ধারণ করেন । এই ধরনের ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, নিজের অর্ধাঙ্গিনীর এই অধিকারকে কেড়ে নিয়ে তারা কি অনুচিত আচরণ করছেন না ? প্রাচীন কালে নারীরাও পুরুষদের মতো যজ্ঞোপবীত ধারণ করতো । এটির বহু শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় ।

৩. যজ্ঞোপবীতের গ্রহণ করা হলো যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার প্রথম ক্রিয়া । তারপর যজ্ঞোপবীত ধারণকারীই যজ্ঞ করার এবং যজ্ঞ করানোর অধিকার প্রাপ্ত হয় । প্রায়ই দেখা যায় যে, গৃহস্থালী আচার অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন সংস্কারে যজ্ঞোপবীত ধারণ না করেই যজমান আসনে উপর এসে বসে পড়েন, অথবা তাঁকে আসনে বসিয়ে সাময়িকভাবে কাঁধের উপর একটা যজ্ঞোপবীত পড়িয়ে দেওয়া হয়, যা তিনি যজ্ঞের পরিশেষে বাহিরে গিয়ে ফেলে দেয় । আচার্য এবং পুরোহিতকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করানোর আগে যজমানকে এটি সংকল্প করানো উচিত এবং তাঁর থেকে প্রতিজ্ঞা নেওয়া উচিত যেনো তারা এই পবিত্র প্রতীক কখনোই ত্যাগ না করে । কর্মকাণ্ডে অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা বিকল্প হতে পারে, মূল না ।

৪ . যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র নিম্ন ত্রিত্বের প্রতীক বলা যেতে পারে—

(অ) যজ্ঞোপবীত ধারণকারীর নিজের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিও উত্তরদায়িত্ব রয়েছে। তাদের বিকাশের তাঁর অবদান রাখতে হবে।

(আ) দেব, ঋষি এবং বিদ্বানদের সেবা অবশ্য কর্তব্য।

(ই) যজ্ঞোপবীতধারীর মানসিক ভাবনার , হৃদয়ে উৎপন্ন অনুভূতির তথা বাহ্য কর্মের শুদ্ধি এবং পবিত্রতাকে সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রদান করা উচিত ।

(ঈ) ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই তিন অনাদি তত্ত্বের প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করা উচিত । সেই প্রকৃতির পদার্থের যথোচিত ব্যবহার করা উচিত, অন্য জীবসমূহের কল্যাণ কামনা করে নিজের আত্মাকে উন্নত করা উচিত তথা বিধাতা ঈশ্বরের প্রতি নিজের ভক্তিতে কোনো স্বল্পতা আসতে না দেওয়া ।

(উ) যজ্ঞোপবীতকে স্বচ্ছ রাখা, মলিনতা এবং অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা আবশ্যক ।

(ঊ) মল-মূত্র বিসর্জনের সময় যজ্ঞোপবীত কানে আটকে রাখা প্রয়োজন, যেনো তাঁর শরীরের নিচের অংশ পর্যন্ত না পৌছায় এবং অপবিত্র না হয় । এটিই হলো এটির মহত্ত্ব ।

সত্যার্থ প্রকাশ ও মহর্ষি দয়ানন্দ সম্পর্কে যা বলেছিলেন ভারতের ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন মোরারজী দেসাই

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ’সত্যার্থ প্রকাশ’ এক অমূল্য গ্রন্থ, যাতে মানবীয় মূল্যের প্রতি তাঁর গভীর আস্থার ঝলক পাওয়া যাত । তিনি অস্পৃশ্যতার কট্টর বিরোধী ছিলেন এবং তিনি অচ্ছ্যুত ও দলিতদের উত্থানের জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন । তিনি এমন এক সমাজের কল্পনা করেছিলেন যা সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক এবং উঁচু-নিচু ভাবনা মুক্ত হবে ।

মহর্ষি দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ নিয়ে যা বললেন পূর্ব রাজ্যমন্ত্রী শের সিংহ -

যুগপ্রবর্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলকামনাকে নিয়ে যে যাত্রা করেছিলেন তা আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি । ’ সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ ’ - এই কামনাই ব্যক্ত করা হয়েছে । সম্পূর্ণ মানবতার সাথে তাদাত্ম্য স্থাপিত করার জন্য ’ বসুধৈব কুটুম্বকম্’এর অবধারণা ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্যসম্পদ যাকে আর্যসমাজ নিজের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ’মুক্তহস্ত’-এ বিতরণ করছে যাতে কটুতা, ঘৃণা এবং হিংসা এই বিশ্ব থেকে চিরকালের জন্য দূরীভূত হয় ।

প্রেমের বিয়ে কী গান্ধর্ব বিবাহ ? এটি কী ধর্মীয় দৃষ্টিতে বৈধ ?

ভগবান মনু স্বীয় মনুস্মৃতিতে ৮ প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন । যথাক্রমে -

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ।।
মনুস্মৃতি ৩।২১

অর্থাৎ, বিবাহ আট প্রকার, যথা- ব্রাহ্ম, , দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও অধম পৈশাচ ।

মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করার আগে জেনে নেওয়া উচিত মহর্ষি মনু গান্ধর্ববিবাহ বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন । মহর্ষি মনু বলেন -

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংয়োগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ।।
মনুস্মৃতি ৩।৩২

অর্থাৎ, বর ও কন্যার ইচ্ছানুসারে উভয়ের যে সংযোগ হয় এবং কামাসক্ত হয়ে উভয়ে মনে মনে স্বীকার করে নেয় যে, তারা উভয়ে স্ত্রী-পুরুষ—এরূপ বিবাহকে গান্ধর্ববিবাহ বলে।

এই বিবাহ বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য একটি শব্দ হলো 'মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ' অর্থাৎ এখানে কামনাজাত মৈথুন অর্থাৎ শারীরিক আকর্ষণই মূখ্য ।

বৈবাহিক দায়িত্ব এখানে মূখ্য বিবেচ্য নয় । তাই যারা কিনা নানাবিধ বাধার কারণে স্বীয় অভিরুচিতে বিয়ে করে গান্ধর্ববিবাহ বলে তাকে বৈধতা দিতে চাচ্ছেন নিজের অজান্তেই কী সেই বিয়েকে নিজের মানহানির কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করছেন না ?

যে মনুস্মৃতিতে এই ৮ প্রকার বিয়ের কথা আছে তাতেই গান্ধর্ববিবাহকে নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য বলা হয়েছে -

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা ।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্বিবর্জয়েৎ ॥
মনুস্মৃতি ৩।৪১-৪২

অর্থাৎ, এই চার প্রকার বিবাহ বাদে অবশিষ্ট—আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই ৪ (চারি) প্রকারের দুষ্ট বিবাহে উৎপন্ন সন্তান নিন্দিত কর্মের কর্তা মিথ্যাবাদী, বৈদিক ধর্মের বিদ্বেষী ও নীচ স্বভাবযুক্ত হয় । এজন্য যে সব নিন্দিত বিবাহে সন্তান নীচ হয়, তা ত্যাগ করে যে সব উত্তম বিবাহে সন্তান উত্তম হয়, তা-ই করা অত্যুত্তম কার্য ।

সারতত্ত্বঃ

১। বৈদিক শাস্ত্রে কন্যা ও বরের যাচাই-বাছাই করার অনুমোদন বিদ্যমান -

https://www.agniveerbangla.org/2023/02/blog-post_22.html?m=1

২। যদি উপযুক্ত সাদৃশ্য, শারীরিক -মানসিক বৈসাদৃশ্য না থাকে , গুণ - কর্মস্বভাবজাত স্ববর্ণ হয় ইত্যাদি সমস্যা না থাকে তবে তাদের মধ্যে বিবাহ হবে। যদি উপযুক্ততা সত্ত্বেও মাতা-পিতা তা না মানেন তবে তা বৈদিক শাস্ত্রের উলঙ্ঘন।

৩। অধুনা নর-নারীরা নানা বাধার কারণে বিবাহকে উপলক্ষ রেখেই নিরুপায় হয় আইনি ও ধর্মীয়ভাবে যে বিয়ে করেন তা উৎসাহপ্রদায়ক না হলেও তারা নিরুপায় হয়েই করেন । এমতাবস্থায় যেহেতু তা কামনাবাসনা বিষয়ভোগের জন্য নয় বরং পরিস্থিতিবশতঃ বাধ্য হয়ে করছেন তাকে মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ" অর্থাৎ শারীরিক ভোগ সর্বস্ব নামে মাত্র বিবাহ অর্থাৎ গান্ধর্ববিবাহ না বলা উচিত।

৪। কুতর্ককারীরা বলেন বিবাহ বিবাহই, তাই গান্ধর্ব নামকরণেও আপত্তি নেই । কিন্তু গান্ধর্ববিবাহ নাম মহর্ষি মনু প্রদত্ত তাই এই বিবাহের স্বরূপ নিয়ে মহর্ষি মনুর মতামতই চূড়ান্ত। পাশাপাশি মহর্ষি মনু ৮ প্রকার বিবাহে কেবল প্রকার বলেছেন। উত্তম ও নিকৃষ্ট পরে বিভক্ত করেছেন।

গান্ধর্ববিবাহ যদি বিবাহ হয় তবে জোর করে বা মদ্যপ কন্যা তুলে নিয়ে করা রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ এসকল সম্ভোগকারীদের নিকট প্রকৃত বিবাহ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে তো ?

অর্থাৎ, যদি কেউ গান্ধর্ববিবাহ করেছে বলে তাহলে বুঝতে হবে, কেবল শারীরিক সম্ভোগ ও কামনার বশীভূত হয়ে তারা একত্রিত হয়েছে।

আর্যসমাজের ১০ নিয়মের ব্যাখ্যা

আর্যসমাজ মূলত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত দশটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতিগুলো হচ্ছে:

১. সব সত্যবিদ্যা এবং যা পদার্থবিদ্যা দ্বারা জানা যায় সেসবের আদিমূল পরমেশ্বর।

২. ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র তারই উপাসনা করা উচিত।

৩. বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সকল আর্যের পরম ধর্ম।

৪. সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকবে।

৫. সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিত।

৬. সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।

৭. সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত।

৮. অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিত।

৯. প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, কিন্তু সবার উন্নতিতে নিজের উন্নতি ভাবা উচিত।

১০. সব মানুষকে সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাইকে স্বতন্ত্র থাকা উচিত।

প্রথম নিয়মঃ— নিমিত্ত অথবা চৈতন্য কারণকে আদি মূল (First cause) বলে। কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, এ ক্ষেত্রে 'কুম্ভকার নিমিত্ত (আদি) কারণ এবং 'মাটি' উপাদান কারণ (Material cause)। পরমেশ্বরকে দুইটি বস্তুর 'নিমিত্ত কারণ' বলা হইয়াছেঃ—

সত্যবিদ্যা (১) যাহা যাহা পদার্থবিদ্যা দ্বারা জানা যায়, তিনকালেই যে জ্ঞান একরূপ থাকে। তাহাকে সত্যবিদ্যা বলে।

সে কোন্ জ্ঞান যাহা তিন কালেই একরূপ থাকে? উহা—ঈশ্বর, জীব এবং (কারণরূপ) প্রকৃতির জ্ঞান। এই অর্থে পরমেশ্বরকে যে আদি (মূল) কারণ বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি ঐ (ঈশ্বর+জীব+কারণরূপ প্রকৃতির) জ্ঞানের আদি কারণ। তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, যেহেতু উহারা নিত্য (অনাদি পদার্থ) অতএব তিনি ঐ বস্তুর ও (ঈশ্বর+জীব+কারণরূপ প্রকৃতিরও) আদি কারণ। এই সত্যবিদ্যারই নাম বেদ, যাহা তৃতীয় নিয়মে উক্ত হইয়াছে। এই জন্য নিয়মোক্ত প্রথম কথাই এই যে, পরমেশ্বর সত্যবিদ্যা অর্থাৎ বেদের আদি মূল। এইজন্য ঈশ্বরকে আদি গুরুও বলা হয় [স এষ পূর্বেষামপি উরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ (যোগ দর্শন ১।২৬)] ।

বিদ্যা (২) বিদ্যা পরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানকে বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে পরিবর্ত্তনীয় বস্তু কি?—কার্য্যরূপ প্রকৃতি। কার্য্যরূপ প্রকৃতিরই নাম সৃষ্টি। পরিবর্তনীয় বস্তু সকলের (জগতের) জ্ঞানও পরিবর্ত্তনীয়। এইজন্য সৃষ্টি বিদ্যা বা জগতের জ্ঞানকে পরিবর্তনীয় জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান (বিদ্যা) দ্বারা মনুষ্য জগতের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। অতএব সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ (জগতের উপাদান কারণ—প্রকৃতি) সংক্ষেপতঃ প্রথম নিয়মে এই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর বেদ এবং জগতের নিমিত্ত (আদি) কারণ ।

এই ভাব ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত ঋকে প্রকট হইয়াছে—

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধান্ত- পসোহধ্যজাযত"

(ঋগ্বেদ ১০।১৫।১।১)

অর্থাৎ ঋত (বেদ) এবং সত্য (প্রকৃতি) জ্ঞানময় পরমেশ্বরের সামর্থ্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ—এই নিয়মে দুইটি কথা আছে। প্রথম কথা এই যে, পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী দয়ালু ইত্যাদি সত্ত্বাত্মক গুণসকল দ্বারা সগুণ, এবং নিরাকার, অজন্মা অনন্ত, নির্ব্বিকার, অনাদি প্রভৃতি অভাবাত্মক গুণ দ্বারা নির্গুণও। নিয়মের মধ্যে দ্বিতীয় এই কথা বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ (সগুণ+নির্গুণ) ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য দেব। তিনি ভিন্ন কাহারও উপাসনা করা উচিৎ নহে। এই নিয়মে বর্ণিত "সবর্বশক্তিমান" কথার ভাব এই যে, ঈশ্বর নিজের (সৃষ্টি) নিয়মের মধ্যে থাকিয়া নিজের অসীম শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। স্বয়ং কখনও নিজের নিয়মের উল্লঙ্ঘন করেন না। অর্থাৎ এরূপ হইতে পারে না যে, ঈশ্বর কোন অন্যায় করেন। বা করিতে পারেন অথবা আপন সদৃশ আর এক পরমেশ্বরকে উৎপন্ন করিতে অথবা নিজেকে বধ করিতে (১) পারেন ইত্যাদি (২)।

(১) সর্বশক্তিমান" কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারায় মুসলমানদিগের মধ্যে দুই সম্প্রদায় হইয়াছিল। উহারা সর্বদা পরস্পর বিরোধ করিত। এক সম্প্রদায়ের নাম "অশারী"। ইহারা বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর সকল কাজ করিতে পারেন, তিনি নির্দোষীকে দণ্ড দিতেও পারেন এবং দোষীকে মুক্তি দিতেও পারেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম "মৌতজিলা"। ইহারা বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর নিয়ম এবং মর্য্যাদার অনুকুলে সকল কাজ করিয়া থাকেন। তিনি নির্দোষীকে দণ্ড দেন না এবং অপরাধীকে ক্ষমা করেন না। যখন "অশঅরী" সম্প্রদায়ের রাজ্য ছিল তখন তাঁহারা অন্যায় করিয়া হাজার হাজার "মৌতজিলা" মুসলমানকে বধ করিয়াছিলেন। (আরবী ইতিহাস "মলিল ও নহিল")

(২) "সর্বজ্ঞ" কথার সম্বন্ধেও জনসাধারণের মধ্যে এই প্রকারের ভুল দেখা যায়। সর্বজ্ঞ এবং "ত্রিকালজ্ঞ" শব্দের একই অর্থ, এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, যেহেতু ঈশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিন কালের কথাই জানেন অতএব মানুষ ভবিষ্যতে কি করিবে তাহাও জানেন। যদি তাহাই হয়, তবে মানুষ ঈশ্বরের জ্ঞানানুকূলে কার্য করিতে বাধ্য। এমতাবস্থায় জীবের কর্ম করিবার স্বাধীনতা রহিল না। এবং "স্বতন্ত্রঃ কর্তা" এই অনুসারে সে স্বতন্ত্র না হওয়ায় কর্তাও রহিল না, অতএব সকল কার্য্যেরই কর্তা ঈশ্বর। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ ইহা সত্য এবং তিনি ইহাও ভালরূপে জানেন যে, কি নিয়মে প্রলয় হইবে এবং তাহার পর কি প্রকারে জগৎ উৎপন্ন হইবে। তিনি এ কথাও জানেন যে, মনুষ্যকৃত পাপ কর্মের কি কি ফল হইবে ইত্যাদি। পরন্তু আমাদের পাপ কর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান কিরূপ ইহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। মনুষ্য যখন কোন কর্ম্ম করে তখন সর্ব্বপ্রথমে তাহার মনে চিন্তা উপস্থিত হয়। যে পর্য্যন্ত মনে তাহার ঐ চিন্তা উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ কর্মের অভাব বর্তমান থাকে। চিন্তা উপস্থিত হওয়া অবধি ঐ কর্মের ভাব (সত্ত্বা) আরম্ভ হয়। জ্ঞাতার পক্ষে ভাবকে ভাব এবং অভাবকে অভাব বলিয়া জানাই প্রকৃত জ্ঞান। কেহ যদি ভাবকে অভাব এবং অভাবকে ভাব বলিয়া মনে করে, তবে উহা বিপরীত (মিথ্যা) জ্ঞান হইল। এইজন্য, মনুষ্য যে কর্মের চিন্তা মনেও আনে নাই তাহার অভাব সংজ্ঞা হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরেরও ঐ পদার্থের অভাব জ্ঞান হইয়া থাকে। যে সময় হইতে মানুষ কোন কর্ম্মের বিষয় মনে করে, তখন হইতে ঐ কর্ম 'ভাব' পদার্থ হইল এবং তখন হইতেই ঈশ্বর তাহাকে ভাব পদার্থরূপেই জানিতে পারেন। এই প্রকারে ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ হইলেও মনুষ্যের স্বতন্ত্র কর্তা হইবার পক্ষে বাধা নাই।

তৃতীয় নিয়মঃ —পরমেশ্বর সত্য বিদ্যার আদিমূল এই কথা প্রথম নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় নিয়মে বলা হইয়াছে যে, বেদ সত্য বিদ্যার পুস্তক। এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, (যাহা প্রথম নিয়মের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে) বেদের আদিমূল (প্রকাশকর্তা) পরমেশ্বর। এইজন্য বেদ শ্রবণ এবং অধ্যয়ন করা আর্য্যদের সাধারণ ধর্ম্মই নহে, কিন্তু পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

চতুর্থ নিয়ম :—ইহা আর্যসমাজের শোভা। যে সকল সম্প্রদায় সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরর্থক বিষয় লইয়া নিজেরা মরিতে এবং অপরকে মারিতে প্রস্তুত। ইসলামের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এক মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায় কর্তৃক সামান্য মতভেদের কারণ নিহত হইয়াছে, অথবা ইহুদী ঈসাই প্রভৃতি অমুসলমানকে মুসলমানেরা বধ করিয়াছে, এরূপ বহু ঘটনা উহাতে পাওয়া যায়।

এই নিয়ম সেই সকল সম্প্রদায় হইতে আর্যসমাজকে পৃথক্ করিতেছে। কারণ, আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক সত্যকে এমনই শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করিতেন এবং এই জন্য যে, বেদ এবং উপনিষদেও ঈশ্বরকে "সত্য" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশ্বর "সত্যম্" একথার অর্থ কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। "সত্যম্" শব্দ তিনটী শব্দের যোগে উৎপন্ন—স+তি+যম্। "স"=জীব, "তি"=ব্রহ্মাণ্ড এবং "যম্"=শাসক। এই প্রকার পরমেশ্বরের নাম "সত্য"। ইহা এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, তিনি জীব এবং জগৎ উভয়কে শাসনে রাখেন (বৃহ, অ-৫, ব্রা-৫; ক ১)। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই (সত্যম্) ব্রহ্মকে কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? উপনিষদের উত্তর এই যে,—"তৎসত্যে প্রতিষ্ঠিতম্" সেই ব্রহ্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব সত্যপ্রাপ্ত হইলেই এবং সত্য আচরণ করিলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)। ফলে ইহাই জানা গেল যে, সত্য হইতে বিমুখ হওয়া—ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হওয়ার তুল্য। এই জন্য বৈদিক সাহিত্যে সত্যের এত মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

পঞ্চম নিয়মঃ — এই নিয়ম শিক্ষা দিতেছে যে, কর্ত্তা প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং বিচার করিয়া করিবেন। কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তিনি বিচার করিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইবেন যে, করণীয় কার্য্য ধর্ম্ম কার্য্য এবং উহাতে অসত্যের কোন অংশ নাই। বৈদিক সাহিত্যে "সত্য" এবং "ধর্ম্ম" এক পর্য্যায় বাচক বিবেচিত হয়। এইজন্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে :-

"যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহু ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীতি।"
"যাহা ধর্ম্ম তাহাই সত্য, এজন্য সত্যবাদীকে বলা হয় সে ধর্ম্ম কহিতেছে। এইরূপ যে ধর্ম্ম কহিতেছে তাহাকেও বলা হয় যে, সে সত্য বলিতেছে" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ অধ্যায় ১ ব্রাহ্মণ ৪ কণ্ডিকা ১৪)। অতএব এই নিয়মের উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু বন্ধ করিয়া কাহারও অনুসরণ করার প্রথা পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাক্। এই প্রথা সত্যের হ্রাস এবং অসত্যের বৃদ্ধি করিয়াছে।

ষষ্ঠ নিয়মঃ—এই নিয়মে দুইটী বিষয় বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আর্য্যসমাজ যে [বৈদিক] ধর্ম্মের প্রচার করিতেছে উহা কোনও দেশ বা জাতি বিশেষের জন্য নহে। কিন্তু সমগ্র সংসারের জন্য। প্রমাণস্বরূপ ঋগ্বেদের এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্। অপঘ্নন্তো অরাণঃ" (ঋগ্বেদ ৯, ৬৩, ৫)। অর্থাৎ দুর্গুণের বিনাশ এবং ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির জন্য সমস্ত বিশ্বকে আর্য্য করিয়া লও। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি এবং সমাজের তিন প্রকারের উন্নতি করিতে হইবে, যথা— শারীরিক আত্মিক, এবং সামাজিক উন্নতি।

সপ্তম নিয়মঃ—এই নিয়ম সামাজিক ব্যবহারের মর্য্যাদা নিয়মিত করিতেছে। যথাঃ—যে ব্যক্তি যাহার যোগ্য তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে। পরন্তু প্রত্যেক ব্যবহার প্রীতি ও প্রেমের সহিত করিবে।

অষ্টম নিয়মঃ—অবিদ্যা (অজ্ঞান) রূপী দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া বিদ্যা (জ্ঞান) রূপী বল দ্বারা সংসারের সকল লোককে বলবান করিবার শিক্ষা এই নিয়ম দ্বারা দেওয়া হইতেছে।

নবম নিয়মঃ—এই নিয়ম শিক্ষা দিতেছে যে, সংসারে সমস্ত কলহের কারণ স্বার্থটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে।

প্রত্যেক মনুষ্য যদি নিজের উন্নতি সাধনের সময় অপরের উন্নতি সাধনের কথা চিন্তা করে, তবে সংসার শান্তিধাম হইয়া উঠিবে।

দশম নিয়মঃ—এই নিয়ম জাতি ও সমাজ এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা অঙ্কিত করিয়া এতদুভয়ের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহার বিধান দিয়াছে। ব্যক্তিগতহিত সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য করিবার প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে। পরন্তু যে কার্য্য সর্ব্বহিতকারী ও যাহার সহিত সমাজের হিত বিজড়িত আছে সেই কার্য্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সমাজের নিয়মাধীন মনে করিবে। এই বিধান দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নতি হইতে পারে।

মনুষ্য এই সংসারে তিনটি কর্তব্য পালন করিবার জন্য আসে -

১। আপনার প্রতি কর্তব্য।

২। অপরের প্রতি কর্তব্য।

৩। পরমেশ্বরের সমষ্টিরূপে আর্যসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য।

আর্য সমাজের দশ নিয়মের ভিতর দিয়া নিয়মের উপর একদৃষ্টি এই তিনটি কর্তব্যের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

[১] প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে পরমেশ্বরের প্রতি কি কর্তব্য তাহার বিধান আছে। অর্থাৎ পরমেশ্বর জগতের রচয়িতা এবং বেদের প্রকাশক এই বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করা মানুষের কর্তব্য।

[২] আর্যসমাজের ৩, ৪, ৫, নিয়মে মনুষ্য নিজের প্রতি কি কর্তব্য পালন করিবে, তাহার বিধান দিয়াছে। ঐ কর্তব্যগুলি এই :-

১। নিজে বেদ পড়িবে, অপরকেও পড়াইবে, নিজে শুনিবে অপরকেও শুনাইবে।

২। অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবে।

৩। প্রত্যেক কার্য্য সত্যাসত্য বিবেচনা করিয়া সম্পাদন করিবে।

[৩] মনুষ্য অপর মনুষ্যের প্রতি কি কর্তব্য পালন করিবে শেষ পাঁচটি নিয়মে তাহার বিধান আছে। এবং সে কর্তব্যগুলি এই —

১। মনুষ্য মাত্রেরই শারীরিক আত্মিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য যত্নবান থাকা উচিত।

২। বিদ্যার বিস্তার করিতে হইবে।

৩। নিজের উন্নতির সহিত অপরের উন্নতির কথাও চিন্তা করিবে।

৪। সকলকে সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে।

আমরা দেখিলাম যে, আর্যসমাজের নিয়মগুলি যদিও সংখ্যায় দশটি তথাপি উহাদের মধ্যে এত বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে যে, উহা ব্যক্তি ও সমাজের ক্রমোন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত।

মূল রচনাঃ মহাত্মা নারায়ণ স্বামী ।

আর্য সমাজ কর্তৃক খ্রিস্ট-মত খণ্ডন বাঙ্‌ময়

শ্রীমৎ মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ জী তাঁর রচিত অমরগ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের ১৩তম সমুল্লাসে খ্রিষ্ট-মত খণ্ডন করেন এবং বিস্তৃত পর্যালোচনা করেন । মহর্ষি তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র ভারতের বিবিধ স্থানে বিখ্যাত পাদরিদের সহিত বাইবেল নিয়ে শাস্ত্রার্থ করেছেন এবং খ্রিষ্টমত খণ্ডন করেছেন অতি প্রবলভাবে । এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিখ্যাত প্রবচন সভাতেও তিনি খ্রিষ্ট-মত খণ্ডন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন ।

এছাড়াও আর্যসমাজের ইতিহাসে খণ্ডন পরম্পরা এখনো অব্যাহত রয়েছে । এই নিবন্ধে আমরা পূর্ব বিদ্বানদের খণ্ডন ও সমালোচনাত্মক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবো।

১. সম্মত পরীক্ষা → শ্রী কানাইয়ালাল চৌবে ; মু. চুন্নীলাল যন্ত্রালয়, ফতহগঢ়

২. ঈসাঈ মত খণ্ডন → শ্রী কানাইয়ালাল চৌবে

৩. এক পণ্ডিত ঔর ঈসাঈ কে বিবাদ কা বৃত্তান্ত → শ্রী কানাইয়ালাল চৌবে

৪. ঈসূ পরীক্ষা → শ্রী জগতনারায়ণ ; ভিক্টোরিয়া প্রেস, বনারস, ১৮৮৪ সন

৫. ঈসাঈ মত পরীক্ষা → শ্রী জগতনারায়ণ ; ভারত জীবন প্রেস, বনারস, ১৮৮৫ সন

৬. বাইবেল বিরোধ → শ্রী ব্রজভূষণ ; ভূষণ প্রেস, মথুরা

৭. বাইবেল কে পরস্পর বিরোধ → শ্রী নন্দকিশোরসিংহ (ঠাকুর) [অনুবাদক] ; বৈ.ধ. সভা, জয়পুর, ১৮৯৭ সন ; শ্রী সোমদেব শর্মা ; ১৯৭৯ বিক্রমাব্দ

৮. স্বধর্ম রক্ষা (১৭ই আগষ্ট ১৮৮৪ সনে প্রয়াগে প্রদানকৃত ব্যাখ্যান) → শ্রী সমর্থদান (মনীষী) ; ভারত জীবন প্রেস, কাশী, ১৮৮৮ সন

৯. খ্রীষ্টী ধর্মানুযায়ী → শ্রী বালকৃষ্ণ রামচন্দ্র মোঘে ; বৈ. য. প্রয়াগ, ১৮৮৫ সন

১০. ক্রিশ্চিয়ন মত দর্পণ → শ্রী পণ্ডিত লেখরাম জী আর্য পথিক [মূল লেখক] ভাষান্তর: শ্রী রামবিলাস ; মার্চ, ১৮৯৭ সন

১১. ঈসাইয়ো কে হাথ সে ভাইয়ো কো বাঁচাও → শ্রীজয়চন্দ্র (লালা) ; কিশনচন্দ্রপ্রেস, লাহৌর, ১৮৯৮ সন

১২. ইঞ্জিল কলাম ইলাহী নহী → শ্রী মহানসিংহ ; জালন্ধর, ১৮৯৯ সন

১৩. বাইবেল কলাম ইলাহী নহীং (উর্দু) → শ্রী কাশীরাম ; জালন্ধর, ১৯০০ সন

১৪. হজরত ঈসা কা ভারত মে আগমন → শ্রী ঠাকুর প্রসাদ শাহ ; আ. স.দানাপুর, ১৯৫৬ বিক্রমাব্দ

১৫. ঈসাঈ তত্ত্বদর্শন [ভাগ-১] → শ্রী মাধবপ্রসাদ চতুর্বেদী ; ধার্মিক যন্ত্রালয়, প্রয়াগ

১৬. ঈসাঈ কপট দর্পণ [ভাগ- ১] (আর্য তত্ত্ব প্রকাশ নামক পুস্তকের খণ্ডন) → শ্রী আলারাম সন্ন্যাসী (উপদেশক, গোরক্ষিণী সভা, কানপুর)

১৭. ঈসাঈ মত ঢোল কী পোল → শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ; মারবাড় রাজ্য,জোধপুর

১৮. অজ্ঞান নিবারণ (পাদরি কা উত্তর) → শ্রী পণ্ডিত ছুট্টনলাল স্বামী ; স্বামী প্রেস মেরঠ

১৯. ঈসা মসীহ কী ত্রিশ সাল জিন্দগী কে নামালূম হালাত (উর্দু) → শ্রী বজীরচন্দ্র বিদ্যার্থী ; আ.প্র. সভা, পাঞ্জাব

২০. ঈসা ভারত কে কদমো পর (উর্দু) → শ্রী পণ্ডিত কালীচরণ শর্মা ; আর্য মুসাফির বুক ডিপো, আগরা

২১. ঈসাঈ মত দর্পণ → শ্রী পণ্ডিত কালীচরণ শর্মা ; আর্য মুসাফির বুকডিপো, আগরা, তিমির নাশক গ্রন্থ- ৩

২২. বাইবেল মত পরীক্ষা → শ্রী পণ্ডিত কালীচরণ শর্মা ; আর্য মুসাফির বুকডিপো,আগরা, তিমির নাশক গ্রন্থ- ১০

২৩. মে ঈসাঈ ক্যো নহী ? → শ্রী পণ্ডিত কালীচরণ শর্মা ; আর্য মুসাফির বুকডিপো, আগরা, তিমির নাশক গ্রন্থ- ৯

২৪. পাদরি সাহেব ঔর মৌলবি সাহেব কী বহস → শ্রী বেদরত্ন ; আর্য মুসাফির বুকডিপো, আগরা, তিমির নাশক গ্রন্থ- ৪

২৫ ঈসূ চরিত্র (ভাগ-১) → শ্রী রঘুনাথ তিওয়ারি

২৬. ঈসাইয়ো কে নবী রসূল → শ্রী বিশ্বনাথ আর্য

২৭. পাদরি ঔর পরমাত্মা → শ্রী ভোলাসিংহ (ঠাকুর) ; আর্য গ্রাম সুধার সভা, আগরা

২৮. ঈসাঈ লীলা → (ভাগ-১)→ শ্রী বাবুরাম শর্মা ; বৈ. পু. প্র. ফণ্ড, লখীমপুর, ১৮৯৫ সন

২৯. ঈসাঈ মত খণ্ডন বৈ. পু. প্র. ফণ্ড

৩০. কৃষ্ণ কে ক্রাইস্ট → সন্নূলাল গুপ্ত ; শ্যামমনোহর শুক্ল, বুলন্দশহর, ১৯১৩ সন

৩১. পাদরি সাহেব ঔর রামদাস → শাস্ত্রার্থ মহারথী স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী

৩২. ঈসাঈ বিদ্বানো সে প্রশ্ন → শাস্ত্রার্থ মহারথী স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী ; ১৯১২ সন

৩৩. মসীহী মজহব কে নিয়মো পর অকলী নজর → শাস্ত্রার্থ মহারথী স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী

৩৪. পাদরি সাহেব ঔর ভোন্দূ জাট কা শাস্ত্রার্থ) → শাস্ত্রার্থ মহারথী স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী ; ১৯৩২ সন

৩৫. ঈসাঈ মত কে বিদ্বানো সে প্রশ্ন → দর্শনানন্দ সরস্বতী ; বৈ. পু. মুরাদাবাদ, লাহৌর

৩৬. ঈসাঈ মত পরীক্ষা → দর্শনানন্দ সরস্বতী, বৈ০ পু০ মুরাদাবাদ, লাহৌর।

৩৭. ঈসাঈ মত মে মুক্তি অসম্ভব হৈ → দর্শনানন্দ সরস্বতী, বৈ০ পু০ মুরাদাবাদ।

৩৮. ঈসাঈ মত খণ্ডন → দর্শনানন্দ সরস্বতী, গো০ ০ হা০, ১৯৮৪ বিক্রমাব্দ ।

৩৯. পাদরিয়ো কো চুনৌতী → দর্শনানন্দ সরস্বতী, আ০ প্র০ সভা পঞ্জাব

৪০. ভারতবর্ষ মে ঈসাঈ মত কৈসে ফৈলা → মহাত্মা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জী সরস্বতী , গু০ কাং০, ১৯৭৫ বিক্রমাব্দ

৪১. ঈসাঈ পাদরিয়ো কো চুনৌতী → স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আ০ স০ বুলন্দশহর, ২০২৫ বিক্রমাব্দ ।

৪২. পাদরিয়ো সে ৩৬ প্রশ্ন, ঈসাঈ পাদরি উত্তর দে, শ্রদ্ধানন্দ সংন্যাসী, অরাষ্ট্রীয় মত নিরোধ সমিতি ।

৪৩. ঈসাঈ মত কা বিষবৃক্ষ → শ্রী পণ্ডিত ওমপ্রকাশ আর্য অরাষ্ট্রীয় মত নিরোধ সমিতি

৪৪. ভারত মে ঈসাঈ → শ্রী মহেশপ্রসাদ মৌলবী (আলিম ফাজিল) ; বুকডিপো, কাশী ।

৪৫. ঈসাঈ মত কা জানাজা (বাইবেল কা জানাজা) → পণ্ডিত ভোজদত্ত শর্মা

৪৬. ঈসাঈ সিদ্ধান্ত দর্পণ, রামচন্দ্রপ্রসাদ বর্মা, বৈ০ পু০ মুরাদাবাদ।

৪৭. তূফান বেতমীজী → শ্রী সজ্জনসিংহ বর্মা (ঠাকুর)

৪৮. শিক্ষাপ্রদ বার্তালাপ → শ্রী রামপ্রসাদ ; অছূতোদ্ধার সমিতি, পঞ্জাব ।

৪৯. ঈসা কা জীবন বৃত্তান্ত → শ্রী নারায়ণপ্রসাদ (মহাত্মা) ।

৫০. ঈসা কী মৃত্যু কা রহস্য → শ্রী হরিশরণ আর্য ; ঝজ্জর, ১৯৬৬ সন

৫১. ঈসাঈ মত খণ্ডন → শ্রী জ্যোতিস্বরূপ (মুন্শী)

৫২. বাইবেল কী পোল

৫৩. ঈসাঈ মত লীলা

৫৪. সত্যমত পরীক্ষা (তহক়ীকুল ইল্হাম-তৌরেত খণ্ডন সত্যমত নিরূপণ কা উত্তর) → শ্রী রামনাথ (লালা)

৫৫. ঈসাঈ মত কী নিস্সারতা → শ্রী শিব শর্মা

৫৬. ঈসাইয়ো কে খূনী কারনামে → পণ্ডিত চতুরসেন গুপ্ত

৫৭. ঈসাইয়ো কে দেশ মে মানব চাণ্ডাল সে ভী বদতর → শ্রী লাজপতরায় (লালা)

৫৮. বাইবেল কী বিধ্বংসকারী শিক্ষা → শ্রী লালতাপ্রসাদ যাদব ; জয়দেব ব্রাদার্স

৫৯. ঈসাঈ মত কা কচ্চা চিট্ঠা → শ্রী লালতাপ্রসাদ যাদব ; ১৯৫৪ সন । ৬০. বাইবেল মে বর্ণিত বর্বরতা তথা অশ্লীলতা কা দিগ্দর্শন [পণ্ডিত শিবপূজনসিংহ কুশবাহ] , ২০১১ বিক্রমাব্দ

৬১. ঈসাঈ দম্ভ কা প্রত্যুত্তর, শিবপূজনসিংহ কুশবাহা ; আর্য তর্ক মণ্ডল,কানপুর

৬২. ঈসাঈ মত কী ছানবীন → কাশীনাথ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী (২০১২ বিক্রমাব্দ)

৬৩. ভারত মে ঈসাইয়ত → শ্রী দেবীচন্দ্র

৬৪. বিদেশী ঈসাঈ মিশ্নরী কনফারেন্স (অধ্যক্ষীয় ভাষণ) → শ্রী হরনামদাস (কবিরাজ)

৬৫. ঈসাঈ মত কী আলোচনা → পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়

৬৬. ঈসাঈ মত সমীক্ষা (খুদা কা বেটা), গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়,

৬৭. পাদরি সাহব সে বাচো গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়

৬৮. ঈসাইয়ো কা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র→ শ্রী গোবিন্দরাম হাসানন্দ

৬৯. আর্য দয়ানন্দ সরস্বতী ঔর মসীহী মত পর্যালোচন শিবপূজনসিংহ কুশবাহা ।

৭০. ঈসা মসীহ ঔর কুমারী মরিয়ম → শিবদয়ালু

৭১. ক্যাথালিক ঈসাইয়ো কা ষড়যন্ত্র → শ্রী শিবদয়ালু

৭২. কৈথালিক ঈসাঈ পন্থ কা নগ্ন চিত্রণ, শিবদয়ালু (১৯৫৬ সন)

৭৩. থামস পেন ঔর ঈসাঈ মত, শিবদয়ালু, (২০২১ বিক্রমাব্দ)

৭৪. বিশ্ব মে রোমান ক্যাথালিক মত কী স্থিতি → শ্রী শিবদয়ালু, ২০২১ বিক্রমাব্দ

৭৫. পাশ্চাত্য বিদ্বান্ ঔর ঈসাইয়ত → শ্রী শিবদয়ালু (২০২২ বিক্রমাব্দ)

৭৬. রোমান ক্যাথালিক চার্চ ক্যা হৈ ? শিবদয়ালু (১৯৬৪ সন)

৭৭. গোরে পাদরিয়ো কে কালে কারনামে → শ্রী মদনগোপাল সিংহল (১৯৫৬ সন)

৭৮. ঈসাঈ পাদরি উত্তর দে → শ্রী কালীচরণ আর্য

৭৯. ঈসাঈ পাদরিয়ো কে চক্র সে দেশ কো বচাও কালীচরণ আর্য

৮০. ভারত মে ভয়ঙ্কর ঈসাঈ ষড়যন্ত্র → শ্রী ওমপ্রকাশ ত্যাগী (২০১১বিক্রমাব্দ)

৮১. বিদেশী আক্রান্তা ঈসাঈ পাদরিয়ো সে প্রশ্ন → ওমপ্রকাশ ত্যাগী (১৯৫৬ সন)

৮২. ঔর পাদরি ভাগ গয়া ওমপ্রকাশ ত্যাগী

৮৩. স্বতন্ত্রতা খতরে মে ওমপ্রকাশ ত্যাগী

৮৪. বাইবিল কো চুনৌতী ওমপ্রকাশ ত্যাগী (জনজ্ঞান প্রকাশন দিল্লী)

৮৫. জ্ঞান-বিজ্ঞান কা শত্রু ঈসাঈ মত → ওমপ্রকাশ ত্যাগী (১৯৬৯ সন)

৮৬. ঘোর আক্রমণ → পণ্ডিত দেব প্রকাশ

৮৭. ইঞ্জিলো মে পরস্পর বিরোধী কল্পনা → পণ্ডিত দেব প্রকাশ

৮৮. ঈসাঈ মত কা বাস্তবিক রূপ → পণ্ডিত দেব প্রকাশ

৮৯. ঈসাঈ মত পোলপ্রকাশ → শাস্ত্রার্থ মহারথী পণ্ডিত শান্তিপ্রকাশ

৯০. ঈসাইয়ত কী বাস্তবিকতা শান্তিপ্রকাশ

৯১. সেণ্ট জেবিয়র কে গোরে পাদরিয়ো কী কালী করতূতেং, শান্তিপ্রকাশ

৯২. ঈসাইয়ো কী প্রচার প্রণালী → শ্রী জগৎকুমার শাস্ত্রী

৯৩. পোপ কী সেনা কা ভারত পর হামলা → শ্রী ভারতেন্দ্রনাথ

৯৪. ভারত কো ঈসালৈণ্ড বনানে কা ষড়যন্ত্র অরাষ্ট্রীয় মত নিরোধ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

৯৫. বাইবেল কী অদ্ভুত বাতে, → শ্রী শিবানন্দ তীর্থ তথা গোবিন্দপ্রসাদ আর্য ; রাঁচী (১৯৬৫ সন)

৯৬. ঈসাঈ বন্ধুও সে আপীল → শ্রী গোবিন্দপ্রসাদ আর্য

৯৭. রাষ্ট্রঘাতী বিষবৃক্ষ → শ্রী অমর প্রভাকর (১৯৬৫ সন)

৯৮. সত্য কী পরখ → আর্য প্রাদেশিক সভা কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৯৮ সন)

৯৯. ঈসাইয়ো কো আর্যসমাজ কী চুনৌতী → এ. বাল রেড্ডী

১০০. ফেরর কা ভণ্ডাফোড় → শ্রী বিশ্বনাথ

১০১. ফেরর নগ্নস্বরূপ (তেলুগু)

১০২. অজ্ঞান নিবারণ

১০৩. ৭২ প্রশ্ন: শঙ্কা সরোবর → শ্রী রামকৃষ্ণ শর্মা

১০৪. ফর্জী মসীহ → রামকৃষ্ণ শর্মা

১০৫. ধর্মতুলা → শাস্ত্রার্থ মহারথী পণ্ডিত বিহারীলাল শাস্ত্রী (১৯৬৭ সন)

১০৬. ধর্মস্বাতন্ত্র্য বিধেয়ক ক্যো ? →শ্রী রঘুনাথপ্রসাদ পাঠক

১০৭. বাইবেল কে গপোড়ে → শ্রী অনূপসিংহ (মধুর প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৭০ সন)

১০৮. ঈসাঈ মত ঔর উসকী কালী করতূতে → শ্রী সূর্যবলী পাণ্ডেয়

১০৯. বাইবেল দর্পণ → শাস্ত্রার্থ মহারথী শ্রীরাম আর্য (১৯৬৭ সন)

১১০. ঈসাঈ মত কা পোল খাতা শ্রীরাম আর্য (১৯৬৯ সন)

১১১. মরিয়ম ঔর ঈসা শ্রীরাম আর্য, ১৯৭০ সন

১১২. ঈসা মসীহ মুক্তিদাতা নহী থা, শ্রীরাম আর্য ১৯৭১ সন

১১৩. বাইবেল পর সপ্রমাণ ৩১টি প্রশ্ন, শ্রীরাম আর্য ১৯৭১ সন

১১৪. রহনুমাএ হক (উর্দু) → শ্রী গোবিন্দলাল প্রণবধারী আর্য (১৮৮৬ সন)

১১৫. ঈসাঈ ক্যো বনতে হো → শ্রী বিহারীলাল শাস্ত্রী তথা বিশুদ্ধানন্দ শাস্ত্রী

১১৬. ঈসাঈ মত সমীক্ষা, দর্শনানন্দ সরস্বতী

১১৭. ঈসাইমত মে জলবায়ে বেদ → শ্রী লক্ষ্মণ আর্যোপদেশক (লাহৌর)

১১৮. বাইবেলের আত্মখণ্ডন (বাংলা) → শ্রী শঙ্করনাথ

১১৯. ভারতে খ্রিষ্টান সমস্যা ও তাহার প্রতিকার (বাংলা) →শ্রী পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদ শাস্ত্রী

১২০. বাইবেল কা কচ্চা চিটঠা (উর্দু) → শ্রী লক্ষ্মণ আর্যোপদেশক

১২১. আইনা এ ইঞ্জীল (উর্দু) লেখরাম আর্য পথিক

১২২. ইঞ্জীল কলামে ইলাহী নহী (উর্দু) → শ্রী কাশীরাম উকিল, (১৮৯৯ সন)

১২৩. বাইবেল কা খুদাবন্দ (উর্দু) → শ্রী গঙ্গারাম

১২৪. য়সূ নাসরী → পাঞ্জাব আর্য প্রতিনিধি সভা কর্তৃক প্রকাশিত

১২৫. মোজ্জাতে ঈসবী → পাঞ্জাব আর্য প্রতিনিধি সভা থেকে প্রকাশিত

১২৬. ঈসাঈ মত পরীক্ষা → কানাইয়ালাল আর্য

১২৭. ইঞ্জিল পরীক্ষা (উর্দু) → শ্রী দয়ারাম

১২৮. ঈসূ চরিত্র → শ্রী মুন্শী চিন্তামণি

১২৯. ঈসাঈ মত মহিমা → শ্রী কানাইয়ালাল শর্মা

১৩০. ভারতীয় শিষ্য ঈসা → (মূল: নিকোলস নোটোবিচ) অনুবাদক: শ্রী হরিদ্বারীসিংহ বেদিল তথা ভীমসেন শর্মা (জ্বালাপুর, ১৯১৪ সন)

১৩১. বাইবেল সমীক্ষা → পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত শর্মা (১৯০০ সন)

১৩২. কিরানীলীলা-বেশ্যালীলা →শ্রী বাবূরাম শর্মা (সরস্বতী যন্ত্রালয়, প্রয়াগ,১৮৯৩ সন)

১৩৩. হিন্দুও কা ঈসাঈকরণ → বী.বখতাবরসিংহ

১৩৪. ঈসাঈ বিদ্বানো সে ৫০ প্রশ্ন → জিয়ালাল বর্মা

১৩৫. মৈনে ঈসাঈ মত ছোড়কর ক্যো বৈদিক ধর্ম গ্রহণ কিয়া ? → শ্রী জ্ঞানেন্দ্র প্রভু

১৩৬. হজরত ঈসা কী মৃত্যু কা বৃত্তান্ত, এক দৃষ্ট সাক্ষী দ্বারা → শ্রী শ্যামলাল সত্যদেব (বরেলী)

ইংরেজি খণ্ডনাত্মক সাহিত্য

1. Dogmas of Christianity, Durga Prasad, V. P. Lahore 2. The Bible exposed (with comments) Pt. I Shankar Nath, Aryavarta Press, Bhawanipur, 1902

3. The Bible exposed (with comments) Pt. 2. Shankar
Nath, Aryavarta Press, Bhawanipur, 1903 4. Christ who and what he was ? Shankar Nath, Lala Tekchand Tandon. London.

5. Christ, Pt. I An Indian Disciple and a Buddhist Saint, Shankar Nath

6. Christ Pt. II A Pure Vedantist, Shankar Nath, W.C. Sharma, Lahore

7. Is not Christianity false and Fabulous religion? Kahan Chandra (Master), W.C. Sharma, Lahore,
1917, II Ed. 8. Christ: A Myth, Kahan Chandra Varma, Lahore, 1983 V. X Ed., 1985 V. 1928

9. The Concept of God in Christianity and Vedic Dharma, Dharm Dev Vidya vachaspati, 1924 10. Christianity and Vedas: A Critical Study, Jangyan,1972

11. Self Contradictions of the Bible.

12. Crucification by an eye-witness, Narain Swami (Ed.), 1. Dayanand Birth Centenary Committee. 1925 Centenary Series. 8, 2. S. Sabha, 1960.

13. Christianity in India, Ganga Prasad Upadhyaya, Religious Renaissance Series. 7, A-S. Chowk, 1941

14. Questions on Bible, A. S. Dehradun, 1954

15. Memorandum to the Home-Minister regardaing ac- tivities of the missionaries. Dayanand Salvation Mission Hoshiarpur, 1954
16. Christianity in India, Devi Chand, Dayanand Sal- vation Mission Hoshiarpur
17. A Challenge to the Chiristian Faith, Shraddhanand (Swami), 1. A. P. Sabha Punjab, 1964, 2. Jangyan, 1969
18. Religious Intolerance, Shraddhanand (Swami), Prem Pustakalaya, Agra
19. History of the Assassins (German Book translated in Englsh) C. J. Von Hammer, Tr. Oswald Charles Wood, 1. Swami Shraddhanand, Delhi, 1928, 2. D. S., 1983
20. Anti Foreign missionary Conference: Presidential address, Harnam Das (Kaviraj)
21. Christianity examined, Dharmajit Jigyasu, New Delhi, 1968 22. Christ Versus Christianity Shiv Dayalu, A.P. Sabha, U.P.
23. Thomas Paine and Christianity Shiv Dayalu, A. P. Sabha, 1965
24. The Bible in the Balance, Charles Smith, Aryodaya, Delhi
25. Christianity Unmasked, Brahmadatta Bharti A. P. Sabha, Punjab, 1964
26. The Christian Love Brahmadatta Bharti A. P. Sabha, Punjab, 1964
27. The Conflict between Science and Christianity Brahmadatta Bharti A. P. Sabha, Punjab, 1964
28. The Truth Behind the Resurrection of Christ Brahmadatta Bharti A. P. Sabha, Punjab, 1967
29. The Vedas and The Bible Brahmadatta Bharti A. P. Sabha, Punjab, 1967
30. The Crimes of Christianity, S. W. Foote, J. M. Wheeler
31. If I Become a Christian? Ganga Prasad Upadhyaya, Vishwa Prachar Series 9
32. Foot Prints of Christ. Babu Ram Patel, A. P. P. Sabha

33. Ferrer Unmasked, Vishwanath Brahmachari, A. P.

34. Christianity in the eyes of Pt. Nehru, S. Sabha

35. Some Questions on the Bible. Ramchandra Dehlvi, S. Sabha

36. Verdict against Bible and Christianity, Karam Narain Kapoor, S. Sabha.

37. Bible in India (Abridged), Keshav Dev Shastri

38. Unknown Life of Jesus. Keshav Dev Shastri

কালিকা পুরাণে নরবলি কি অপরাধীদেরই দেওয়া হতো ?
মিথ্যাচারের খণ্ডন

কয়েকজন দাবি করেছেন কালিকা পুরাণে যে নরবলির উল্লেখ আছে তা নাকি অপরাধীদেরই দেওয়া হতো । অন্য কাউকে না । আসল কথা পুরো ভিন্ন । দেওয়া হতো শত্রুর পরাজয় কামনা করে অন্যকে আর যদি শত্রুকে হারানো যায় তবে তাকে । আসুন কথা না বাড়িয়ে আর ষাঁড়ের মত গোঁয়ার না হয়ে কালিকা পুরাণ থেকেই সরাসরি পড়ি -

যখন যখন শত্রুর বৃদ্ধি দেখিবে, তখন তখন তাহার ক্ষয় কামনা করিয়া অপরের শিরচ্ছেদ করিয়া বলিপ্রদান করিবে। (৬৭/১৫৪)

এখানে অপরের শিরশ্ছেদের উল্লেখ আছে শত্রুর না ।

ঐ বলিরূপ পশুতে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, ঐ বলির ক্ষয় হইলে শত্রুর বিপদ হয়। (৬৭/১৫৫)

দেখুন পাঠক ! এতোদিন পশুকে নিজের রিপুর প্রতীক বলে এখন পশুকে শত্রুর প্রতীক বানিয়ে বলি দিচ্ছে । শত্রুকে মারার জন্য বেচারা নিরীহ পশুকে মারার কি দরকার ? সরাসরি যুদ্ধে গিয়ে মারলেই তো হয় ।

যব চূর্ণ ময় অথবা মৃন্ময় শত্রুর প্রতিকৃতি করিয়া যথোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া বলিপ্রদান করিবে।(৬৭/১৮৭-১৮৮)

রাজা প্রথমে খড়্গকে আমন্ত্রিত করিয়া শত্রুকে বলি প্রদান করিবে অথবা মহিষ বা ছাগকে শত্রু নামে আমন্ত্রিত করিয়া বলি প্রদান করিবে। (৬৭/১৪৯-১৫২)

দেখুন মজা। খাবার দিয়ে শত্রুর মূর্তি বানিয়ে তারপর সেটার বলি দিতে হবে বা মহিষ/ছাগলকে শত্রুর নামে নিয়ে বলি দিতে হবে । যদি নরবলি মাত্রেই অপরাধীদের দণ্ড হয় এখানে তো অপরাধী বা শত্রু ধরার আগে তার নামেই পশুকে বলি দেওয়া হচ্ছে ।

বলছি মাংসের লোভে জোচ্চুরি আর কত?

"ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ।" (৬৭/৫)

যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন, আর তিনটি নরবলিতে লক্ষ বছর তৃপ্তি লাভ করেন। (৬৭/১৯)

মনুষ্য মাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং আমার রূপধারী ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। (৬৭/২০)

নরবলি অতিবলি অর্থাৎ সব থেকে বড় বলি । আর ১ ও ৩টি নরবলিতে দেবী যথাক্রমে ১০০০ ও ১ লাখ বছর তুষ্ট থাকেন । এখানে শত্রুর উল্লেখ নেই ।

পশু-স্ত্রী, পক্ষিণী বিশেষত মনুষ্য স্ত্রীকে কখনোই বলিপ্রদান করিবে না। স্ত্রীকে বলিদান করিলে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয়। (৬৭/১০১)

শত্রু তো শত্রুই । এখানে আবার স্ত্রীকে বলি দেওয়া যাবে না । অর্থাৎ এখানে কিন্তু ছাড় দেওয়া হচ্ছে ।

গণহারে নরবলির উল্লেখ নিচের শ্লোকে পাওয়া যায়-

যেখানে বিশেষ গণনা না করিয়া একেবারে দলে দলে বলি প্রদান করা হয় সেইস্থলে সমুদয় দল একেবারে অর্চিত করিয়া ভক্তি পূর্বক পশু পক্ষীর স্ত্রী এবং মানুষীকে বলি দিতে পারে। (৬৭/১০২)

দেখুন তো এখানে শত্রুর উল্লেখ আছে ?

“শত্রু ভূপতির পুত্র যদি যুদ্ধে বিজিত হয় , তাহা হইলে তাঁহাকে বলি দিতে পারে।” (৬৭/১০৬-১০৭)

এতোক্ষণ পরে দেখুন । যদি শত্রুর ছেলে হেরে যায় তবে তাকে বলি দেওয়া যাবে । এই হলো অপরাধীর দণ্ড ?

‘মনুষ্যের মস্তকের রুধির দেবীর দক্ষিণদিকে নিবেদন করিবে, ছাগের শিরোরুধির বামদিকে এবং মহিষের শিরোরুধির সম্মুখে নিবেদন করিবে এবং পক্ষীগণের শিরোরুধির বামদিকে নিবেদন করিবে এবং শরীরের শোনিত সম্মুখে নিবেদন করিবে। ’ (৬৭/১১২)

দেখুন রক্তপিয়াসী পিশাচদের লীলা ।

রাজপুত্র, অমাত্য, সচিব এবং সৌপ্তিকগণ রাজার সম্পত্তি ও বিভবের নিমিত্ত নরবলি প্রদান করিবে। (৬৭/১২২)

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট । এখানে রাজার সম্পত্তি আর বৈভবের কামনা করেও নরবলির কথা আছে । এখানে দণ্ডবিধান কোথায় গেলো ? দণ্ড দেওয়া আর ধনসম্পদ কামনা করে নরবলি কি এক কথা ?

কোনোরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে অথবা যুদ্ধকালে কোনো রাজসম্পর্কীয় পুরুষ ইচ্ছানুসারে মনুষ্যবলি প্রদান করিবে। (৬৭/১২৩)

উপদ্রব হলে ও যুদ্ধের সময় রাজা ইচ্ছামত নরবলি দিবে । বলুন তো এখানে দণ্ডের উল্লেখ কোথায় আছে ?

যদি সাধক দক্ষিণহস্তে মনুষ্যের মস্তক এবং বামহস্তে রুধিরপাত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রিজাগরন করে। (৬৭/১৭৮)

তাহা হইলে সে ইহলোকে রাজা হয় এবং অন্তে আমার লোকে গমণ করত গণদিগের অধিপতি হয়। (৬৭/ ১৭৯)

যে সাধক বলিদিগের শিরোরক্ত করদ্বয়ে মাখাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করে। (৬৭/১৮০)

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে সম্মানিত হয়।(৬৭/১৮১)

আর এদিকে সাধক যদি নরবলি দিয়ে উপরের পদ্ধতি পালন করে তবে সে ইহলোকে রাজা হবে । অর্থাৎ এটা রাজা হওয়ার প্রসেস । এখানে অপরাধীদের দণ্ড কোথায় ? ১৮০-১৮১ শ্লোকে শিরোশক্ত আঙুলে রক্ত মাখিয়ে নাকি ধ্যান করবে ? জীবনে শুনেছেন যে দণ্ড দেওয়ার পর এই পদ্ধতিতে কখনো সাধক কোন কাজ করে ?

অতএব প্রমাণিত যে -

১। কালিকা পুরাণে নরবলি কোন দণ্ড ব্যবস্থা না ।

২। সাধারণ মানুষকেও নরবলি দেওয়া যাবে ।

৩। যুদ্ধে জেতার ইচ্ছায় নরবলি দেওয়া যাবে বা পশুবলি দেওয়া যাবে ।

৪। যুদ্ধে জিতলে বিজিতের ছেলেকে নরবলি দেওয়া যেতে পারে ।

৫। সাধক নরবলি দিয়ে রাজা হতে পারবে । এখানেও অপরাধীর দণ্ডের যুক্তি খাটবে না ।

৬। ধনসম্পদ কামনা করেও নরবলি দেওয়া যাবে । এখানে দণ্ড কোথায় ?

কালিকাপুরাণে বলি - গোরু থেকে মানুষ কী নেই সেখানে জানুন

কালিকা পুরাণের সবচেয়ে পুরনো মুদ্রিত সংস্করণটি হল ১৯০৭ সালে প্রাকশিত বোম্বাই ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণটি। এরপর ১৯০৯ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী প্রেস থেকে এর প্রথম মুদ্রিত বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কালিকা পুরাণের ৫৫ তম অধ্যায়ে শিববাক্য -

বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্যাদ্ দেব্যাঃ প্রমোদকম্ ।
মোদকৈর্গজবক্ত্রং চ হবিষা তোষয়েদ্ধরিম্ ॥ ৫৫.১ ॥
তৌর্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্ ।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥ ৫৫.২ ॥
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাশ্ছাগলাশ্চ বরাহকাঃ।
মহিষো গোধিকাশোষা ততা নববিধা মৃগাঃ॥ ৫৫.৩ ॥
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যাঃ স্বগাত্ররুধিরৈশ্চাষ্টধা বলয়ো মতাঃ ॥ ৫৫.৪ ॥

" ভগবান বলিলেন, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে, কেননা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃত দ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্য দ্বারা শঙ্করকে, এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে নিয়মিত সন্তুষ্ট করিবে।" (৫৫/১-২)

দেবী চণ্ডিকা যেহেতু বলি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, তাই এরপরেই বিভিন্ন রকমের বলির পশুর তালিকা দেওয়া হয়েছে-

"১/ পক্ষী, ২/কচ্ছপ,৩/ কুম্ভীর, ৪/ নবপ্রকার মৃগ যথা- বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ, ৫/ এবং সিংহ, মৎস্য, ৬/ স্বগাত্র রুধির, ৭/ এবং ইহাদিগের অভাবে হয় এবং ৮/ হস্তি এই আটপ্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।"(৫৫/৩-৪)

এছাড়াও কালিকা পুরাণের নানা স্থলে উপরোক্ত পশু ছাড়া বিভিন্ন পশু বলি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পশুবলি বিষয়ক শ্লোকগুলির পরপর উল্লেখ করা হল-

নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।

বরস্তুং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ॥ ৫৫.৮ ॥

সাধক বলিকে বলেন, "তুমি শ্রেষ্ঠ জীব, আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব সর্ব স্বরূপ বলিরূপী তোমাকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। (৫৫/৮)

বলিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, " শর্করা, লবলী, নারংগক, ছাগল, মহিষ, মেষ, নিজের শোণিত, পক্ষী আদি পশু, নয় প্রকার মৃগ- এইসকল উপকরণ দ্বারা নিখিল জগতের ধাত্রী মহামায়ার পূজা করিবে, যাহাতে মাংস ও শোণিতের কর্দম হয়।" (৫৫/৪৭-৫০)

কালিকা পুরাণে শিব তার পুত্রদের বলির বিধানে বলছেন-

ক্রমস্তু বলিদানস্য স্বরূপ রুধিরাদিতঃ ।

যতা স্যাৎ প্রীতয়ে সম্যক্ তদ্ বাং বক্ষ্যামি পুত্রকৌ॥ ৬৭.১ ॥

বলিদানেন সততং জয়েচ্ছত্রূন্নৃপান্ নৃপঃ।

মৎস্যানাং কচ্ছপানাং তু রুধিরৈঃ সততং শিবা॥ ৬৭.৬ ॥

মাসৈকং তৃপ্তিমাপ্নোতি গ্রাহৈর্মাসাংস্তু ত্রীনথ।

মৃগাণাং শোণিতৈর্দেবী নরাণামপি শোণিতৈঃ ॥ ৬৭.৭ ॥

অষ্টৌ মাসানবাপ্নোতি তৃপ্তিং কল্যাণদা চ সা।

গোধিকানাং গৌরুধিরৈর্বাষিকাং তৃপ্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৭.৮ ॥

কৃষ্ণসারস্য রুধিরৈঃ শূকরস্য চ শোণিতৈঃ।

প্রাপ্নোতি সততং দেবী তৃপ্তিং দ্বাদশবার্ষিকোম্॥ ৬৭.৯ ॥

অজাবিকানাং রুধিরৈঃ পঞ্চবিংশতিবার্ষিকীম্।

মহিষাণাং চ খড়গানাং রুধিরৈঃ শতবার্ষিকীম্॥ ৬৭.১০ ॥

তৃপ্তিমাপ্নোতি পরমাং শার্দূলরুধিরৈস্তথা।

সিংহস্য শরভস্যাথ স্বগাত্রস্য চ শোণিতৈঃ॥ ৬৭.১১ ॥

দেবী তৃপ্তিমবাপ্নোতি সহস্রং পরিবৎসরান্।

মাংসৈরপি তথা প্রীতি রুধিরৈর্যস্য যাবতী॥ ৬৭.১২ ॥

কৃষ্ণসারং মৃগং খড়গং ততা মৎস্যং চ রোহিতম্।

বার্ধ্রীংণসযুগং চাপি ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক্॥ ৬৭.১৩ ॥
কৃষ্ণসারস্য মাংসেন তথা খড়েগন চণ্ডিকা।
বর্ষাণাং চ শতান্যেব তপ্তিমাপ্নোতি কেবলম্॥ ৬৭.১৪ ॥
রোহিতস্য তু মৎস্যস্য মাংসৈর্বার্ধ্রীণসস্য চ।
তৃপ্তিং প্রাপ্নোতি বর্ষাণাং শতানি ত্রীণি মৎপ্রিয়া॥ ৬৭.১৫ ॥
তৃপ্নুবন্তিন্দ্রিয়ক্ষীণং স্বেতং বৃদ্ধমজাপতিম্।
বার্ধ্রীণসঃ প্রোচ্যত্যেসৌ হব্যে কব্যে চ সংকৃতঃ॥ ৬৭.১৬ ॥

"ভগবান বলিলেন- হে পুত্রদ্বয়! বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ অর্থাৎ যে প্রকার রুধিরাদি দ্বারা দেবীর সম্পূর্ণ প্রীতি হয়,তোমাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি।" (৬৭/১)

"মৎস্য ও কচ্ছপের রুধির দ্বারা শিবা দেবী নিয়ত এক মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং গ্রাহ্যদিগের রুধিরাদি দ্বারা তিন মাস তৃপ্তি লাভ করেন।" (৬৭/৭)

"দেবী মৃগ ও মনুষ্য শোণিত দ্বারা আটমাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং সর্বদা কল্যাণ প্রদান করেন।" (৬৭/৮)

"গো এবং গোধিকার রুধিরে দেবীর সাংবাৎসরিক তৃপ্তি হয়।" (৬৭/৯)

"কৃষ্ণসার এবং শূকরের রুধিরে দেবী দ্বাদশ বার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। "(৬৭/১০)

"অজ ও আবিক রুধিরে দেবীর পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী এবং মহিষ শার্দূল এবং খড়্গ রুধিরে দেবীর শতবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ হয়।" (৬৭/১১)

"সিংহ, শরভ এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে দেবী সহস্র বৎসর ব্যাপীয়া তৃপ্তি লাভ করেন।" (৬৭/১২)

"যাহার রুধিরে যাবৎকাল তৃপ্তির কথা হইয়াছে, মাংস দ্বারাও ততকাল তৃপ্তি লাভ হয়।" (৬৭/১৩)

"কৃষ্ণসার মৃগ, গণ্ডার, রোহিত মৎস্য, যুগল বার্ধ্রীণস এই সকল বলি দানের পৃথক পৃথক ফল শ্রবণ কর।" (৬৭/১৪)

"কৃষ্ণসার ও গণ্ডারের মাংসে চণ্ডিকা দেবী পঞ্চশত বর্ষ নিয়ত তৃপ্তি লাভ করেন।" (৬৭/১৫)

"আমার পত্নী দুর্গা, রোহিত মৎস্যের মাংসে এবং বার্ধ্রীণসের মাংসে তিন শত বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন।" (৬৭/১৬)

প্রদানে কৃষ্ণসারস্য মন্ত্রোয়ং পরিকীর্তিতঃ।
কৃষ্ণসার ব্রহ্মমূর্তে ব্রহ্মতেজোবিবর্ধন॥

“কৃষ্ণসারের বলিদান সময়ে বক্ষ্যমান মন্ত্রের পাঠ করিবে। হে কৃষ্ণসার ! তুমি ব্রহ্ম মূর্তি এবং ব্রহ্মতেজের পরিবর্ধনকারী।“(৬৭/৬৩)

খড়গস্য তু যদা দানং ক্রিয়তে তন্ত্রমন্ত্রকম্।

জলেনাভ্যুক্ষ্য কুর্বীত গুহ্যজাতেতি ভাষয়ন্।

“যে পূজায় গণ্ডার বলি প্রদত্ত হইবে, সেই স্থলে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া গুহা হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করত একটি মণ্ডল করিবে।“(৬৭/৬১)

গোরু-মহিষ বলি

কালিকা পুরাণে একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, বিভিন্ন প্রকার বলির বিবরণে গরু-মহিষও পড়ছে। নিচের সেই সংক্রান্ত শ্লোকগুলির উল্লেখ করা হলঃ

পক্ষিণঃ কঞ্ছপা গ্রাহা মৎস্যা নববিধা মৃগাঃ।

মহিষো গোধিকা কাবশ্ছাগো রুরুশ্চ শূকরঃ ॥ ৬৭.৩ ॥

খড়গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকা শরভো হরিঃ।

শার্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরং তথা॥ ৬৭.৪ ॥

চণ্ডিকাভৈরবাদোনাং বলয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ।

বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবম্॥ ৬৭.৫ ॥

“ পক্ষী সকল, কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক, গো, ছাগ, রুরু, শূকর,খড়্গ, কৃষ্ণ সার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দূল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির , ইহারা চণ্ডিকা দেবী ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্তিত হইয়াছে। (৬৭/৩-৫)

মহিষং প্রদদেদ্ দেব্যৈ ভৈরব্যৈ ভৈরবায় বা ।

অনেনৈব তু মন্ত্রেণ তদা তং পূয়যেদ্ বলিম্॥

“যখন ভৈরবী দেবী অথবা ভৈরবীকে মহিষ বলি প্রদান করিবে তখন সেই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে।“ (৬৭/৫৮)

অষ্টৌ মাসানবাপ্লোতি তৃপ্তিং কল্যাণদা চ সা।

গোধিকানাং গৌরুধিরৈর্বাষিকাং তৃপ্তিমাপ্নুয়াৎ॥

“গো এবং গোধিকার রুধিরে দেবীর সাংবাৎসরিক তৃপ্তি হয়।“(৬৭/৯)

"অর্চনা দ্বারা অপরাপর মহিষ প্রভৃতির বলির শরীর বিশুদ্ধিলাভ করে, এই নিমিত্ত দেবী তাহা হইতে রক্ত গ্রহণ করেন।" (৬৭/৯৬)

"সাধক মহিষ এবং মনুষ্যের রক্তের কিঞ্চিত অংশ মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মহাকৌশিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পূর্ব হইতে নৈঋত কোণে পুতনাদি দেবতার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার উপর বলি প্রদান করিবে।" (৬৭/১৪৬-১৪৭)

বলিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, " শর্করা, লবলী, নারংগক, ছাগল, মহিষ, মেষ, নিজের শোণিত, পক্ষী আদি পশু, নয় প্রকার মৃগ- এইসকল উপকরণ দ্বারা নিখিল জগতের ধাত্রী মহামায়ার পূজা করিবে, যাহাতে মাংস ও শোণিতের কর্দম হয়।" (৫৫/৪৭-৫০)

হে পুত্রদ্বয়! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বিশেষ চতুর্দশী তিথিতে ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলি মধু ও মৎস্য দ্বারা ভৈরবীরূপী আমাকে তুষ্ট করিবে; আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইব। (৬৭/২০৩)

নরবলির উৎস

পশুবলির পাশাপাশি কালিকা পুরাণে নরবলিও দেখা যায়। নিচে নরবলি সংক্রান্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হল-

"ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ।" (৬৭/৫)

যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন, আর তিনটি নরবলিতে লক্ষ বছর তৃপ্তি লাভ করেন। (৬৭/১৯)

মনুষ্য মাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং আমার রূপধারী ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। (৬৭/২০)

যেহেতু বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভিষ্ট, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিবে। (৬৭/২১-২২)

বিচক্ষণ সাধক ভোজদ্রব্যের সহিত লোমশূণ্য মাংস দান করিবে এবং কখন কখন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দান করিবে। (৬৭/২৩)

রক্তশূণ্য মস্তক অমৃত তুল্য পরিগণিত হয়।(৬৭/২৪)

নরপতি মনুষ্যের রক্ত মৃন্ময় অথবা তৈজস পাত্রে রাখিয়া সর্বদা উৎসর্গ করিয়া দিবে, পত্র নির্মিত দ্রোণাদিতে কখনোই দিবে না।(৬৭/৪৭)

এইরূপে পূজা করিয়া পূর্ব তন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্বক পূজা করিবে। নরবলি পূজিত হইয়া আমার স্বরূপ দিকপালগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়। (৬৭/৯১)

এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য সকল দেবগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সেই বলিরূপ নর পূর্বে পাপাচারী হইলেও নিষ্পাপ হইয়া যায়।(৬৭/৯২)

সেই পাপশুণ্য বলিরূপ নরের শোণিত অমৃত তুল্য হয়, উহা দ্বারা জগন্ময়ী জগন্মায়া মহাদেবী প্রীতিলাভ করেন। (৬৭/৯৩)

সেই বলিরূপী নর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া মরিতে মরিতেই গণদিগের অধিপতি হইয়া আমার অধিক সৎকারের পাত্র হয়।(৬৭/৯৪)

এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার পাপযুক্ত মলমূত্র ও বসাযুক্ত বলি কামাখ্যা দেবী নামমাত্রেও গ্রহণ করেন না। (৬৭/৯৫)

পশু-স্ত্রী, পক্ষিণী বিশেষত মনুষ্য স্ত্রীকে কখনোই বলিপ্রদান করিবে না। স্ত্রীকে বলিদান করিলে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয়। (৬৭/১০১)

গণহারে নরবলির উল্লেখ নিচের শ্লোকে পাওয়া যায়-

যেখানে বিশেষ গণনা না করিয়া একেবারে দলে দলে বলি প্রদান করা হয় সেইস্থলে সমুদয় দল একেবারে অর্চিত করিয়া ভক্তি পূর্বক পশু পক্ষীর স্ত্রী এবং মানুষীকে বলি দিতে পারে। (৬৭/১০২)

এছাড়া নিচের শ্লোকগুলিতে নরবলি সংক্রান্ত বাকি শ্লোকগুলি রয়েছে-

“"শত্রু ভূপতির পুত্র যদি যুদ্ধে বিজিত হয় , তাহা হইলে তাঁহাকে বলি দিতে পারে।" (৬৭/১০৬-১০৭)

‘মনুষ্যের মস্তকের রুধির দেবীর দক্ষিণদিকে নিবেদন করিবে, ছাগের শিরোরুধির বামদিকে এবং মহিষের শিরোরুধির সম্মুখে নিবেদন করিবে এবং পক্ষীগণের শিরোরুধির বামদিকে নিবেদন করিবে এবং শরীরের শোনিত সম্মুখে নিবেদন করিবে। ’ (৬৭/১১২)

রাজপুত্র, অমাত্য, সচিব এবং সৌপ্তিকগণ রাজার সম্পত্তি ও বিভবের নিমিত্ত নরবলি প্রদান করিবে। (৬৭/১২২)

কোনোরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে অথবা যুদ্ধকালে কোনো রাজসম্পর্কীয় পুরুষ ইচ্ছানুসারে মনুষ্যবলি প্রদান করিবে। (৬৭/১২৩)

সাধক মহিষ এবং মনুষ্যের রক্তের কিঞ্চিত অংশ মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মহাকৌশিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পূর্ব হইতে নৈঋত কোণে পুতনাদি দেবতার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার উপর বলি প্রদান করিবে। (৬৭/১৪৬-১৪৭)

গণ্ড,ললাট,ভ্রু মধ্যে কর্ণাগ্র,বাহুদ্বয়,স্তনদ্বয়,উদর,কন্ঠের অধঃ ও নাভির উর্ধস্থিত যাবতীয় হৃদয় ভাগ এবং পার্শ্ব- এই সকল অঙ্গের রুধির দেবিকে দান করিবে। (৬৭/১৬৪-১৬৫)

মনুষ্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ রুধির নির্গত করিবার নিমিত্তেই অক্ষুব্ধ চিত্তে আপনার অঙ্গে স্বয়ং আঘাত করিয়া রুধির নির্গত করিয়া পদ্মপুষ্পের পাত্রে , কিংবা সৌবর্ণ পাত্রে অথবা কাংস্যপাত্রে সেই রুধির রাখিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক উহা দেবীকে দান করিবে। (৬৭/১৬৭-১৬৮)

ক্ষুর, ছুরিকা,খড়গ এবং শংকুল প্রভৃতি যতগুলি অস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে যত বড় অস্ত্র দ্বারা শরীরে আঘাত করিবে ততই ফলপ্রাপ্ত হইবে।(৬৭/১৬৯)

একটি পদ্মফুলের পাপড়িতে যতটুকু রক্ত ধরিতে পারে, সাধক তাহার চারিভাগের অধিক রক্ত কখনোই দান করিবে না এবং একেবারে কোনো অঙ্গের ছেদ করিবে না।(৬৭/১৭০)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবশত আপন হৃদয় জাত মাষ প্রমাণ অথবা তিল মুদগ প্রমাণ মাংস দেবিকে অর্পণ করে তাহার ছয় মাসের মধ্যে সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয়। (৬৭/১৭১-১৭২)

যে সাধক স্নেহপাত্র না লইয়া বাহুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয় এবং হৃদয়ে দীপ বর্তী (সলিতা জ্বালিয়া) দেবীকে দান করে , ক্ষণমাত্র তাদৃশ দীপদানের ফল শ্রবণ কর। (৬৭/১৭৩-১৭৪)

সে দেবী গৃহে কল্পত্রয় যথেচ্ছাক্রমে বিপুল ভোগ করিয়া পরে সার্বভৌম রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।(৬৭/ ১৭৫)

মহিষের ছিন্ন মস্তকে দীপ জ্বালাইয়া , যে ব্যক্তি উহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে একটি সমস্ত দিন ও রাত্রি অবস্থান করে।(৬৭/১৭৬)

সে ইহলোকে চিরায়ু ও পবিত্রমূর্তি হইয়া অখিল মনোরম বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তে আমার গৃহে যাইয়া গণাধিপতি প্রাপ্ত হয়।(৬৭/ ১৭৭)

যদি সাধক দক্ষিণহস্তে মনুষ্যের মস্তক এবং বামহস্তে রুধিরপাত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রিজাগরন করে। (৬৭/১৭৮)

তাহা হইলে সে ইহলোকে রাজা হয় এবং অন্তে আমার লোকে গমণ করত গণদিগের অধিপতি হয়।(৬৭/ ১৭৯)

যে সাধক বলিদিগের শিরোরক্ত করদ্বয়ে মাখাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করে। (৬৭/১৮০)

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে সম্মানিত হয়।(৬৭/১৮১)

হে মহামায়ে ,আপনি জগতের কর্ত্রী এবং সর্ব কামার্থ দায়িনী , আপনাকে এই নিজদেহের রুধির দান করিতেছি , আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করুন।(৬৭/১৮২)

এই কথা বলিয়া সিদ্ধ সান্নিভ বিচক্ষণ মানব প্রণাম পূর্বক স্বীয় গাত্রের রুধির প্রদান করিবে। (৬৭ /১৮৩)

ঈশ্বর-ভূতিলাভের নিমিত্ত যে সত্য রক্ষা করিয়া আমি আত্মমাংস দান করিতেছি, হে দেবী, সেই সত্য রক্ষা করিয়া তুমি আমাকে নির্বাণ দান কর। হূঁ হূঁ নমঃ নমঃ পণ্ডিত সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার মাংস দান করিবে।(৬৭/১৮৪-১৮৫)

অনেকে বলেন নরবলি আসলে শত্রুদের দণ্ড দেওয়া । এটা মিথ্যাচার মাত্র । বিস্তারিত - https://back2thevedas.blogspot.com/2023/11/blog-post_13.html

কামাখ্যায় নরবলির উল্লেখ

কামরূপ কামাখ্যার নরবলির বিস্তারিত বিবরণ -

পীঠ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, নিত্য শ্মশানে বলি প্রদান করিবে। ঐ শ্মশান শব্দে হেরুকনামক শ্মশান, উহা কামাখ্যা দেবীর আবাস শৈলে অবস্থিত। ইহা পূর্বে তন্ত্রের আদিতে বিধিবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৬৭/৭২-৭৩)

ঐ শ্মশান আমার স্বরূপ। উহা ভৈরব নামেও অভিহিত হয়। ঐ শ্মশান তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিভাগে কল্পিত হইয়াছে।(৬৭/ ৭৪)

উহার পূর্বাঙ্গ ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে তপস্যা করিলে সদ্য সিদ্ধি লাভ হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। উহার দক্ষিণাঙ্গে

ভৈরবীদেবীকে মুণ্ডমালার সহিত মস্তক প্রদান করিবে এবং হেরুক নামক পশ্চিমাঙ্গে রুধির প্রদান করিবে। (৬৭/ ৭৫-৭৬)

মনুষ্য বলিকে অর্চন ,দান এবং আগমন ক্রমে পীঠস্থানের শ্মশান ভূমিতে বিসর্জন করিয়া বলদীপক প্রজ্বলিত করিবে। (৬৭/৭৭)

এইরূপে যেইখানে মহাবলি প্রদত্ত হইবে, সেইস্থলেই সাধক একস্থানে উৎসর্গ ,একস্থানে ছেদন করিবে এবং অন্যস্থলে মস্তক এবং অন্যস্থলে রুধির প্রদান করিবে। (৬৭/৭৮)

আর একবার বিসর্জন করিয়া পুনরায় আর তাহার দিকে অবলোকন করিবে না। (৬৭/৭৯)

সুস্নাত,দীপ্ত, পূর্ব দিনে হবিষ্যাশী, মাংস , মৈথুন এবং ভোগ বর্জিত, মালা এবং চন্দন দ্বারা অলঙ্কৃত মনুষ্যকে উত্তরমুখ করিয়া তাহার অবয়ব নিচয়ে দেবতা সকলের পূজা করিবে এবং তাঁহাকে দেবতার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাহার পূজা করিবে।(৬৭/ ৮০-৮১)

ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার পূজা করিবে, নাসিকায় পৃথিবীর পূজা করিবে, কর্ণদ্বয়ে শক্তি এবং আকাশের পূজা করিবে, জিহ্বাতে অগ্নির,নেত্রে জ্যোতির, বদনে বিষ্ণুর,ললাটে আমার, দক্ষিণ গণ্ডে ইন্দ্রের, বাম গণ্ডে বহ্নির, গ্রীবায় সমবর্তীর , কেশাগ্রে নিঋতির , ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে বরুণের, নাসিকামূলে পবনের,

স্কন্দে ধনেশ্বরের এবং হৃদয়ে সর্প রাজের পূজা করিয়া বক্ষ্যমান মন্ত্র পাঠ করিবে। (৬৭/৮২-৮৫)

হে মহাভাগ নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব দেবময় এবং উত্তম, তুমি পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত শরণাপন্ন আমাকে রক্ষা কর। (৬৭/৮৬)

মৃত্যু যখন অপরিহার্য তখন তুমি প্রাণত্যাগ কর, এবং পুত্র, অমাত্য ও বন্ধু বর্গের সহিত আমাকে রক্ষা কর।(৬৭/৮৭)

তোমার প্রসাদে রাক্ষস, পিশাচ, বেতালগণ,সরিসৃপগণ , নৃপগণ, রিপুগণ এবং অন্যান্য হিংস্রগণ যেন আমাকে বিনাশ করিতে অক্ষম হয়। (৬৭/৮৯)

মরণ যখন অপরিহার্য তখন তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কণ্ঠনাল হইতে গলিত এবং অঙ্গলগ্ন শোণিতধারা দ্বারা তৃপ্তি লাভ কর।(৬৭/ ৯০)

দেবীকে রক্ত উৎসর্গ -

বলির রক্ত যেভাবে দেবীকে উৎসর্গ করা হত-

আপনার বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র, বেত্রপাত্রের দোনা, মৃন্ময় খর্পর, কাংস্য অথবা যজ্ঞীয় কাষ্ঠ নির্মিত একটি পাত্র করিবে। (৬৭/৪৪)

লৌহপাত্রে, বল্কলে, পিত্তলপাত্রে, রংগের পাত্রে অথবা কাচ পাত্রে কিংবা স্রুক বা স্রুবে বলিদিগের রুধির দান করিবে না। (৬৭/৪৫)

ঐশ্বর্যবিলশী মনুষ্য ঘটে, মাটির উপর,ক্ষুদ্র পান পাত্রে রুধির দান করিবে না। (৬৭/৪৬)

অর্চনা দ্বারা অপরাপর মহিষ প্রভৃতির বলির শরীর বিশুদ্ধিলাভ করে, এই নিমিত্ত দেবী তাহা হইতে রক্ত গ্রহণ করেন।(৬৭/৯৬)

নরপতি মনুষ্যের রক্ত মৃন্ময় অথবা তৈজস পাত্রে রাখিয়া সর্বদা উৎসর্গ করিয়া দিবে, পত্র নির্মিত দ্রোণাদিতে কখনোই দিবে না। (৬৭/৪৭)

মাংসভূক পশু ও পক্ষীগণের এবং সর্ব প্রকার জলজ জীবগণের মস্তক ও রুধির বাম পার্শে রাখিয়া নিবেদন করিবে। (৬৭/১১৩)

কৃষ্ণসার, কূর্ম, গণ্ডার, শশক, কুম্ভীর এবং মৎস্য ইহাদিগের রুধির সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদন করিবে।(৬৭/ ১১৪)

সিংহের রুধির এবং গণ্ডারের রুধির দক্ষিণের রাখিয়া নিবেদন করিবে। দেবতার পৃষ্ঠদেশে কোনো বলির শিরোরুধির দান করিবে না। নৈবদ্য দক্ষিণে, বামে,অথবা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিতে পার, কিন্তু কখনো পৃষ্ঠদেশে নৈবদ্য রাখিবে না। (৬৭/১১৫)

ঐশ্বর্য বিলাশী মনুষ্য ঘটে,মাটির উপর, ক্ষুদ্র পানপাত্রে রুধির দান করিবে না। (৬৭/৫৯)

বলির জীবের মাথা কোনোদিকে পড়লে যে ফল হয় -

পশুবলি বা নরবলি দেওয়ার সময় বলির ছিন্ন মস্তক কোনোদিকে পড়লে যেরূপ ফল লাভ হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

ছিন্ন মনুষ্য এবং পশু প্রভৃতির মস্তক যে যে স্থানে পতিত হইয়া শুভ বা অশুভ হয় তা শ্রবণ কর। (৬৭/১৩০)

মনুষ্যের ছিন্নশির ইশানকোণে বা নৈঋত কোণে পতিত হইলে রাজ্যহানি এবং রাজার বিনাশ সাধন করে। (৬৭/১৩১)

হে ভৈরব! পূর্ব ,আগ্নেয়, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং বায়ুকোণে ঐ ছিন্ন মস্তক পতিত হইলে যথাক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি,ভর, লাভ, পুত্র লাভ এবং ধন উৎপাদন করে। (৬৭/১৩২)

হে ভৈরব! ছিন্ন মহিষের মস্তক উত্তরদিক হইতে এক এক করিয়া বায়ুকোণ অবধি পতিত হইলে যথাক্রমে যে যে ফল লাভ হয় তাহা শ্রবণ কর। ভোগ্য, হানি , ঐশ্বর্য , বিত্ত, রিপুজয়, ভয়, রাজ্যলাভ এবং শ্রী । (৬৭/১৩৩-১৩৪)

জলজ এবং অণ্ডজ ভিন্ন ছাগ আদি নিখিল পশুর মস্তক পতনে দিক অনুসারে ঐরূপ ফল লাভ হয় জানিবে। (৬৭/১৩৫)

জলজ এবং পক্ষীদিগের ছিন্ন মস্তক দক্ষিণে ও অগ্নিকোণে পতিত হইলে ভয় এবং অন্যদিকে পতিত হইলে শ্রীলাভ হয়। (৬৭/১৩৬)

মনুষ্য,পশু, পক্ষী ও কুম্ভিরাদির মস্তক ছিন্ন হইলে যদি দাঁতের কট কট শব্দ হয় তাহা হইলে রোগ উৎপন্ন হয়। (৬৭/১৩৭)

যদি মস্তক ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মল নির্গত হয় , তাহা হইলে যে রাজ্যে এই ঘটনা হয় ঐ রাজ্যের হানি হয়। (৬৭/১৩৮)

মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে যদি নেত্র হইতে লোতক নির্গত হয় , তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বি রাজার মৃত্যু হয়। (৬৭/১৩৯)

অপরাপর বলি পশু প্রভৃতির মস্তক হইতে নির্গত লোতক অতিশয় ভয় এবং পীড়ার সূচনা করে। (৬৭/১৪০)

যদি নরবলির ছিন্নশির হাস্য করে , তাহা হইলে শত্রুর বিনাশ হয় এবং বলিদাতার সর্বদা লক্ষ্মী ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। (৬৭/১৪১)

নরবলির ছিন্ন মস্তক যে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচিরকালেই সফল হয় এবং হুঙ্কার করিলে রাজ্যের হানি হয় এবং শ্লেষ্মস্রাব করিলে কর্তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। (৬৭/১৪২)

যদি ছিন্ন মস্তক দেবতাদিগের নাম কীর্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতা ছয়মাসের মধ্যেই অতুল বিস্তৃতি লাভ করে। (৬৭/১৪৩)

রুধির দানকালে যদি ছিন্ন শরীরের ঊর্ধ বা অধোভাগ হইতে বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয় তাহা হইলে বলিদাতার নিশ্চয় মৃত্যু হয়। (৬৭/১৪৪)

ছিন্নদেহ বামপাদের আক্ষেপ করিলে মহারোগ উৎপন্ন হয় এবং অপর চরণের আক্ষেপে কল্যাণ লাভ হয়। (৬৭/১৪৫)

বলির পদ্ধতি কী ?

বলির পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

বলি দেয়ার আগে "হে খড়্গ তোমার নাম অসি, বিশসন, তীক্ষ্ণধার, দুরাসন, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্মপাল, তোমাকে নমস্কার করি।" (৫৫/১৬) এরূপ বলে তারপরে 'আ, হ্রিং, ফট এইমন্ত্র দ্বারা খড়্গাকে পূজা করিয়া সেই বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিচ্ছেদ' করা হত। (৫৫/১৭)

তারপরে "ছিন্ন বলির রুধির জল, সৈন্ধব, সুস্বাদু ফল,মধু, গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত করিয়া ওঁ, ঐঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ কৌশিকি এই রুধির দ্বারা প্রীতিলাভ কর, এই মন্ত্র বলিয়া যথাস্থানে রুধির নিক্ষেপ করিয়া ছিন্ন মস্তকের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া" রাখতে হত এবং , 'এইরূপে সাধক বলির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত' হত। (৫৫/১৮-২০)

চন্দ্রহাস বা কর্ত্রী দ্বারা বলিচ্ছেদ করাই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে, দাত্র, অসি, ধেনু, করাত বা শংকুল দ্বারা বলিচ্ছেদ মধ্যম এবং ক্ষুর, ক্ষুরপ্র এবং ভল্ল দ্বারা বলিচ্ছেদ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৬৬/২৬)

এতদ্ভিন্ন শক্তি বা বাণ প্রভৃতির দ্বারা কখনোই বলিচ্ছেদ কর্তব্য নয়। বলিদানে যেসকল অস্ত্র উক্ত হইয়াছে , তদ্ভিন্ন অস্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদ করিলে দেবী উহা ভোজন করেন না এবং বলিদানকর্তা শীঘ্রই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।(৬৭/২৭)

যে সাধক প্রোক্ষিত পশু বা পক্ষীকে হস্ত দ্বারা ছেদ করে, সে অতি দুঃসহ ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হয়। (৬৭/২৮)

বিচক্ষণ সাধক খড়্গকে মন্ত্র দ্বারা আমন্ত্রিত না করিয়া কখনোই বলিযোগ করিবেন না। (৬৭/২৯)

বলির উদ্দেশ্য কী ?

কালিকা পুরাণে উল্লেখিত বলির উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল-

"বলি দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়, বলি দ্বারা স্বর্গ সাধিত হয় এবং বলিদান দ্বারা নৃপতিগণ শত্রু নৃপতি গণকে পরাজয় করিয়া থাকেন।" (৬৭/৬)

"তোমার প্রসাদে রাক্ষস, পিশাচ, বেতালগণ,সরিসৃপগণ , নৃপগণ, রিপুগণ এবং অন্যান্য হিংস্রগণ যেন আমাকে বিনাশ করিতে অক্ষম হয়।" (৬৭/৮৯)

"ঐশ্বর্য বিলাশী মনুষ্য ঘটে,মাটির উপর, ক্ষুদ্র পানপাত্রে রুধির দান করিবে না।" (৬৭/৫৯)

যে সাধক বলিদিগের শিরোরক্ত করদ্বয়ে মাখাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করে। (৬৭/১৮০)

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে সম্মানিত হয়।(৬৭/১৮১)

যে সাধক স্নেহপাত্র না লইয়া বাহুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয় এবং হৃদয়ে দীপ বর্তী (সলিতা জ্বালিয়া) দেবীকে দান করে , ক্ষণমাত্র তাদৃশ দীপদানের ফল শ্রবণ কর। (৬৭/১৭৩-১৭৪)

সে দেবীগৃহে কল্পত্রয় যথেচ্ছাক্রমে বিপুল ভোগ করিয়া পরে সার্বভৌম রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।(৬৭/ ১৭৫)

মহিষের ছিন্ন মস্তকে দ্বীপ জ্বালাইয়া , যে ব্যক্তি উহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে একটি সমস্ত দিন ও রাত্রি অবস্থান করে।(৬৭/১৭৬)

সে ইহলোকে চিরায়ু ও পবিত্রমূর্তি হইয়া অখিল মনোরম বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তে আমার গৃহে যাইয়া গণাধিপতি প্রাপ্ত হয়।(৬৭/ ১৭৭)

যদি সাধক দক্ষিণহস্তে মনুষ্যের মস্তক এবং বামহস্তে রুধিরপাত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রিজাগরন করে। (৬৭/১৭৮)

তাহা হইলে সে ইহলোকে রাজা হয় এবং অন্তে আমার লোকে গমণ করত গণদিগের অধিপতি হয়।(৬৭/ ১৭৯)

যে সাধক বলিদিগের শিরোরক্ত করদ্বয়ে মাখাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করে। (৬৭/১৮০)

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে সম্মানিত হয়।(৬৭/১৮১)

কেন ও কখন বলি দিতে হবে ?

যখন যখন শত্রুর বৃদ্ধি দেখিবে, তখন তখন তাহার ক্ষয় কামনা করিয়া অপরের শিরচ্ছেদ করিয়া বলিপ্রদান করিবে। (৬৭/১৫৪)

ঐ বলিরূপ পশুতে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, ঐ বলির ক্ষয় হইলে শত্রুর বিপদ হয়। (৬৭/১৫৫)

“বিরুদ্ধ রূপিনী চণ্ডিকে। বৈরিণং ত্বং খাদয়স্ব স্বাহা!” এই মন্ত্রের নাম খড়্গ মন্ত্র। এই সেই আমার বৈরি যে সর্বদা আমার উপর দ্বেষ করে; হে মহামারি এক্ষণে পশুরূপধারী উহাকে বিনাশ কর। (৬৭/১৫৬-১৫৭)

‘স্ফে স্ফে খাদয় খাদয়’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বলির মস্তকে পুষ্পদান করিবে। তদনন্তর তাহার রুধির দ্ব্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবে। (৬৭/১৫৮)

যব চূর্ণ ময় অথবা মৃন্ময় শত্রুর প্রতিকৃতি করিয়া যথোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া বলিপ্রদান করিবে।(৬৭/১৮৭-১৮৮)

রাজা প্রথমে খড়্গকে আমন্ত্রিত করিয়া শত্রুকে বলি প্রদান করিবে অথবা মহিষ বা ছাগকে শত্রু নামে আমন্ত্রিত করিয়া বলি প্রদান করিবে। (৬৭/১৪৯-১৫২)

আর বেদে জীব হত্যা নিষেধ নিয়ে বিধি -

https://back2thevedas.blogspot.com/2023/10/blog-post_8.html

নোয়াখালী-কোলকাতা দাঙ্গায় আর্যসমাজের ভূমিকা

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬ সালে অখন্ড বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালীর ৮০% মুসলিম বহুল অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু হয়। হিন্দু ঘরবাড়িতে লুটপাট চালানো হয়। হাজারো হিন্দুদের হত্যা করা হয়। হিন্দু নারীদের সতিত্ব হরণ করা হয়। বহুজনের জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ করে মুসলিম বানানো হয়। হিন্দুরা তৎকালীন বাংলার রাজধানী কোলকাতায় পালিয়ে যেতে থাকে।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী যেয়ে হিন্দুদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করলেও মুসলমানেরা তার সিদ্ধান্তকে পুনরায় ভুল প্রমাণিত করে। আশ্রয়হীন সেই হিন্দুদের উপর কোলকাতার অলিগলিতে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম গুন্ডারা যাতে আক্রমণ না করে, তাদের সুরক্ষার জন্য বড়সড় সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।

আর্যসমাজ সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভার নেতৃত্বে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে দিনরাত ২৪ ঘন্টা তাদের সেবা কার্য শুরু করা হয়। বাংলার পূর্বাঞ্চলে সর্বমোট সাতটি কেন্দ্র বানানো হয়েছিল। কেন্দ্রের মাধ্যমে আর্যসমাজ দ্বারা সংগৃহীত আনুমানিক এক লক্ষ টাকা, ২০০০ মন চাল ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়৷ আহতদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে মানসিক শান্তনা প্রদানের সর্বোচ্চ সম্ভব চেষ্টা চালানো হয়। উল্লেখ্য যে, যে সময় মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী পরিদর্শনে যান, তখন তার সাথে সুচেতা কৃপলানীও ছিলেন। মুসলমান দাঙ্গাবাজেরা গান্ধীর দৃষ্টির অগোচরে সুচেতা কৃপলানীকে অপহরণ করে সমগ্র দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল। আর্য সমাজের নেতা ওমপ্রকাশ ত্যাগী জী এখবর জানতে পারেন। গান্ধী ও সুচেতার অবস্থানরত আশ্রমে যখনই মুসলিম দাঙ্গাকারীরা দল বেধে হামলা করতে পৌছায়, তখনই ত্যাগী জী আর্যবীরদের সাথে তাদের রক্ষার্থে পৌছে যান। সুচেতা জী আর্যসমাজের প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

(তথ্যসূত্র: আর্যসমাজ কোলকাতা কা ইতিহাস- উপাকান্ত উপাধ্যায়)

আর্যসমাজ কোলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে অবস্থিত শিব মন্দিরেরও রক্ষা করে মুসলমান গুন্ডাদের হামলা থেকে। এভাবেই মাসব্যাপী সহায়তাকেন্দ্র পরিচালনা করে আর্যসমাজ নিজেদের হিন্দু সমাজের রক্ষক ও প্রহরী হিসেবে প্রমাণ দেয়। ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দীর গুণ্ডাদের থেকে হিন্দুদের রক্ষা করা, তাদের হিন্দুবহুল সুরক্ষিত

এলাকায় পৌঁছে দেয়ার কাজ আর্যসমাজের সদস্যদের দ্বারা যুদ্ধস্তরে করা হয়েছিল।

প্রথমে নোয়াখালীর দাঙ্গা ও পরবর্তীতে কোলকাতার গণহত্যা আজ হিন্দুদের ধর্মরক্ষার্থে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বার্তা দিচ্ছে।

নোয়াখালীর সহায়তাকেন্দ্র: আর্যসমাজ কর্মকর্তাগণ

চিত্র-১: আর্যসমাজের সহায়তাকেন্দ্র

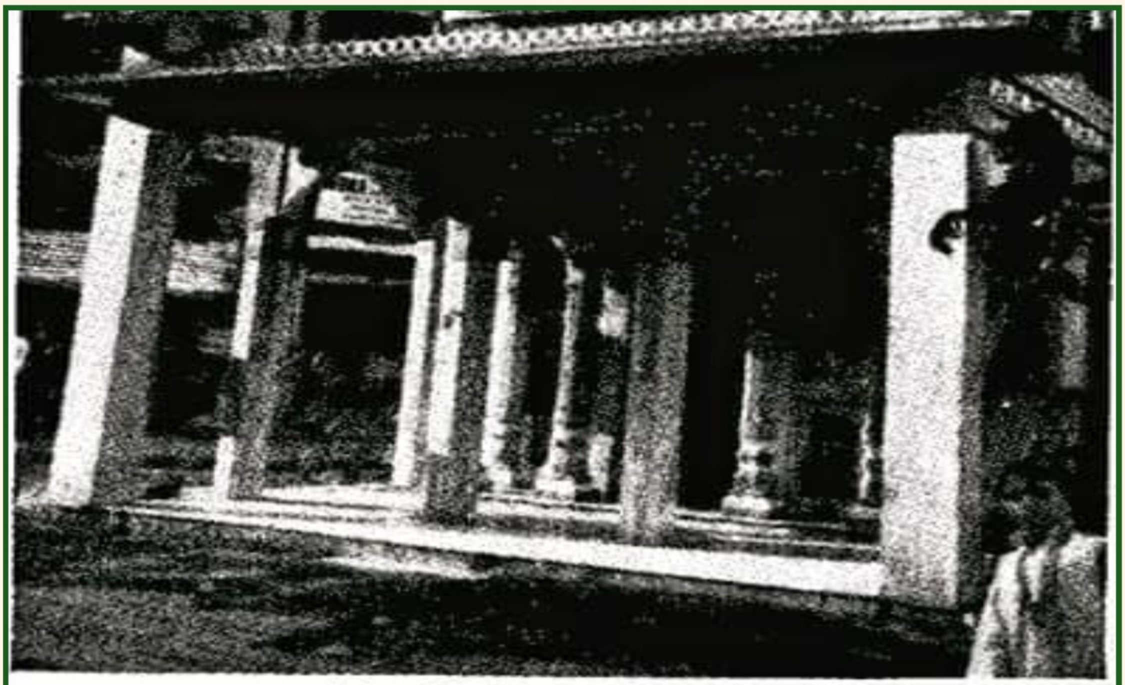

জাকারিয়া স্ট্রিটে অবস্থিত শিব মন্দির
যা মুসলিমদের ধ্বংসাত্মক হামলা থেকে আর্যসমাজ রক্ষা করে

চিত্র-২: জাকারিয়া স্ট্রিটে অবস্থিত শিব মন্দির যা আর্যবীরগণ রক্ষা করেছিল

শাক্তরা কিভাবে দয়ানন্দজীর বলি দিতে ষড়যন্ত্র করেছিলো ?

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নিম্নলিখিত কাহিনী বখশীরাম ও মুন্সি ইন্দ্রমণিকে শুনিয়েছিলেন -

যে দিনগুলোতে আমি একাকী পরিভ্রমণ করতাম, তখন একবার আমি এমন এক জায়গায় গেলাম যেখানে সব শাক্ত বসবাস করে । তারা আমার বহু সেবা- শুশ্রূষা করলো । কয়েকদিন থাকার পর যখন আমি সেখান থেকে চলে যেতে চাইলাম তারা অত্যন্ত আগ্রহ করে আমাকে থেকে যেতে বললো, আমি ভাবলাম যে বোধহয় ভক্তিভাবের জন্য আমাকে থাকতে বলছে । এভাবে বহুদিন কেটে যাওয়ার তাদের অনুষ্ঠানের দিন এলো । সেদিন সমস্ত শাক্ত দেবীর মন্দিরে গিয়ে গান গাইতে লাগলো । সেদিন তারা আমাকেও বললো যে আজকে আমাদের মন্দিরে মহোৎসব, আপনিও চলুন । আমি অনেক বোঝালাম যে দেবী দর্শনে আমার বিশ্বাস নেই কিন্তু তারা শুনতে রাজি না । পায়ে পড়ে আমাকে বলতে লাগলো যদি আজকের উৎসবের দিন আপনি পদার্পণ না করেন তবে আমাদের সমস্ত উৎসাহই নষ্ট হয়ে যাবে । আপনি মূর্তিকে নমস্কার বা অন্য কিছু না করলেন, তবুও আমাদের সাথে চলুন ।

সেই মন্দির নগরের বাইরে এক নির্জন স্থানে ছিলো । তাদের মাধ্যমে বাধ্য হয়ে আমাকে মন্দিরে যেতে হলো । সেসময় উঠানে হোম হচ্ছিলো আর লোকজন উৎসব পালন করছিলো । আমাকে তারা দূর্গা মূর্তি দেখানোর বাহানায় ভিতরে নিয়ে গেলো । আমিও সরল মনে দুর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়ালাম । মূর্তির পাশে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি উন্মুক্ত খড়্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ।

তারা বললো, ' মহাত্মাজী ! মায়ের সামনে অবশ্যই নত হয়ে নমস্কার করবেন '। আমি স্পষ্টভাবে বললাম আমার কাছে এমন আশা দুরাশা মাত্র । আমার কথা শুনে পূজারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ও আমার ঘাড় ধরে আমার মাথা নিচু করতে লাগলো । তার এই ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম । কিন্তু যখনই আমি পেছনে তাকালাম দেখি সেই খড়্গধারী আমার পাশে চলে এসেছে ও আমার ঘাড়ে খড়্গই চালাতে চাচ্ছে ।

আমি এটা দেখামাত্র সাবধান হয়ে গেলাম । আমি দ্রুত ফিরে তার হাত থেকে খড়্গ ছিনিয়ে নিলাম । পূজারী তো আমার বাম হাতের এক ধাক্কাতেই মন্দিরের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো । আমি সেই খড়্গ নিয়ে মন্দিরের উঠানে চলে এলাম । তখন উঠানের সমস্ত লোক কুড়াল, ছুরি ইত্যাদি শস্ত্র নিয়ে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়লো । দরজার দিকে তাকালাম, দেখলাম তাতে তালা লাগানো । বলির থেকে রক্ষার জন্য আমি লাফিয়ে দেয়ালে উঠে গেলাম ও অপর দিকে নেমে বেরিয়ে গেলাম । দিনভর আমি সেখানেই আত্মগোপন করলাম । কিন্তু যখন গভীর রাত হলো তখন আমি অন্য গ্রামে গিয়ে উঠলাম । সেদিন থেকে আমি কখনো শাক্তদের বিশ্বাস করিনি ।

[মহর্ষি দয়ানন্দের জীবন চরিত, দেবেন্দ্রনাথ ও ঘাসীরাম, পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৪]

বিদ্রঃ

পশুবলির পাশাপাশি কালিকা পুরাণে নরবলিও দেখা যায়। নিচে নরবলি সংক্রান্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হল-

"ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ।"

[কালিকা পুরাণ ৬৭/৫]

অর্থাৎ সব বলির মধ্যে মানুষ বলি দেয়া শ্রেষ্ঠ বলি!

যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন, আর তিনটি নরবলিতে লক্ষ বছর তৃপ্তি লাভ করেন।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/১৯]

মনুষ্য মাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং আমার রূপধারী ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/২০]

যেহেতু বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভিষ্ট, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিবে।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/২১-২২]

বিচক্ষণ সাধক ভোজদ্রব্যের সহিত লোমশূণ্য মাংস দান করিবে এবং কখন কখন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দান করিবে।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/২৩]

রক্তশূণ্য মস্তক অমৃত তুল্য পরিগণিত হয়।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/২৪]

নরপতি মনুষ্যের রক্ত মৃন্ময় অথবা তৈজস পাত্রে রাখিয়া সর্বদা উৎসর্গ করিয়া দিবে, পত্র নির্মিত দ্রোণাদিতে কখনোই দিবে না।

[কালিকা পুরাণ৬৭/৪৭]

এইরূপে পূজা করিয়া পূর্ব তন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্বক পূজা করিবে। নরবলি পূজিত হইয়া আমার স্বরূপ দিকপালগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়।

[কালিকা পুরাণ৬৭/৯১]

এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য সকল দেবগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সেই বলিরূপ নর পূর্বে পাপাচারী হইলেও নিষ্পাপ হইয়া যায়।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/৯২]

সেই পাপশুণ্য বলিরূপ নরের শোণিত অমৃত তুল্য হয়, উহা দ্বারা জগন্ময়ী জগন্মায়া মহাদেবী প্রীতিলাভ করেন।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/৯৩]

সেই বলিরূপী নর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া মরিতে মরিতেই গণদিগের অধিপতি হইয়া আমার অধিক সৎকারের পাত্র হয়।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/৯৪]

এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার পাপযুক্ত মলমূত্র ও বসাযুক্ত বলি কামাখ্যা দেবী নামমাত্রেও গ্রহণ করেন না। [কালিকা পুরাণ ৬৭/৯৫]

পশু-স্ত্রী, পক্ষিণী বিশেষত মনুষ্য স্ত্রীকে কখনোই বলিপ্রদান করিবে না। স্ত্রীকে বলিদান করিলে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয়।

[কালিকা পুরাণ ৬৭/১০১]

অর্থাৎ নারীরা বেঁচে গেলেন,ধরে ধরে খালি পুরুষদের বলি দিবেন!

গণহারে নরবলির উল্লেখ নিচের শ্লোকে পাওয়া যায়-

যেখানে বিশেষ গণনা না করিয়া একেবারে দলে দলে বলি প্রদান করা হয় সেইস্থলে সমুদয় দল একেবারে অর্চিত করিয়া ভক্তি পূর্বক পশু পক্ষীর স্ত্রী এবং মানুষীকে বলি দিতে পারে।

[কালিকা পুরাণ, ৬৭/১০২]

এখন প্রশ্ন হল যারা এসব মারাত্মক মস্তিস্ক বিকৃত বই থেকে এক দুটি রেফারেন্স দেখিয়ে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্তির প্যাচে ফেলতে চান,এইসব বইয়ের দোহাই দিয়ে বলেন দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পাঠাবলি দেয়া উচিত তারা খুব চালাকি করে নরবলির শ্লোকগুলোকে এড়িয়ে যান চুরি করে।কালিকা পুরাণ ৫৫ তম অধ্যায় মতে তো নরবলি হল অতিবলি বা পাঠা ইত্যাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলি।

কালিকা পুরাণ ৫৫ নং অধ্যায়ের ১-৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে নবমৃগ-বরাহ,ছাগল,মহিষ,শশক এইসব বলি দেয়া নির্দিষ্ট।অর্থাৎ মহিষও বলি দেয়া যাবে!

আরও মারাত্মক বিষয় হলো কালিকা পুরাণ ৬৭ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোক অনুযায়ী গোমাংস ও গোরক্ত(গো রুধি) নিবেদন করলে দেবী পুরো ১ বছর তৃপ্ত থাকেন-

গোধিকাবাং গোরুধিরৈর্বার্ষিকীং তৃপ্তিমাপ্নুয়াৎ।

এদিকে আবার মানুষের রক্তের দাম গরুর চেয়ে কম,কারণ ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে মনুষ্য শোণিত দ্বারা মানে মানুষের রক্ত দ্বারা দেবী মাত্র ৮ মাস তৃপ্ত হন!

তার মানে তন্ত্র-শাক্ত অনুযায়ী গরু,মহিষ ও মানুষ বলি দেয়া অনুমোদিত।

অর্থাৎ আমরা দেখছি যেসব গ্রন্থ দেখিয়ে পশুবলির পক্ষে কেউ কেউ কথা বলে তন্ত্রের পক্ষ নিয়ে সেইসব বই অনুযায়ী গোমাংস,গোরক্ত,মনুষ্য মাংস,মনুষ্য বলি দিতে হবে দেবীকে। এই শ্লোকগুলো সেই ধূর্ত লোকেরা লুকিয়ে রেখে অন্য শ্লোকগুলো দেখিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে বলি প্রয়োজন এমনটা বলে সাধারণ হিন্দুদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে।কারো ভোজন কী হবে তা নিতান্তই তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে। কিন্তু সেটা না করে বৈদিক ধর্মের নামে মিথ্যাচার করা,অর্ধেক তথ্য দিয়ে মানুষকে ঈশ্বর সন্তুষ্টি করতে পশুবলির হাস্যকর প্রয়োজনীয়তা দেখানো উচিত নয়। ঈশ্বর তো সর্বমহান,সর্বশ্রেষ্ঠ,তাঁকে সন্তুষ্ট করতে মানুষের,গরুর,রক্তমাংসের কী দরকার? এগুলো নিতান্তই আদিম যুগীর চিন্তাভাবনা যেমনটা আমরা বিভিন্ন সিনেমায় অনুন্নত বন্য উপজাতিদের দেখি মানুষ বলি দিতে।তাই যারা এইসব বলির সমর্থক তারা গোমাংস ভক্ষণেরও সমর্থক,মানুষ বলি দেয়ারও সমর্থক উপরে উপরে যতই ভালো ভালো কথা বলুক না কেন।

শেষ করব পবিত্র বেদবাণী দিয়ে-

অনাগো হত্যা বৈ ভীমা কৃত্যে মা নো গাম অশ্বম পুরুষং বধী।

(অথর্ববেদ ১০।১।২৯)

- নির্দোষের হত্যা অবশ্যই ভয়ানক। আমাদের গাভী, অশ্ব, মনুষ্যকে মেরো না।

ইমং মা হিংসীদ্বিপাদ পশু সহস্রাক্ষ মেধায় চীয়মান।

(যজুর্বেদ ১১।৪৭)

-হে সহস্র প্রকার দৃষ্টি যুক্ত রাজন! সুখ প্রাপ্ত করানোর জন্য নিরন্তর বৃদ্ধিশীল এই দ্বিপদী মনুষ্য এবং পশুকে কখনো হত্যা করো না।

মহাপুরুষদের বা পূর্বপুরুষদের ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে মহর্ষি দয়ানন্দের সিদ্ধান্ত কি ছিলো ?

এই বিষয়ে [অষ্টা০ ৫।৩।৯৯] আমাদের অভিপ্রায় এমন নয় যে ব্রহ্মা আদি দেবতা ছিলেন না বা তাদের প্রতিমা রাখা বা দেখা অধর্ম । কিন্তু সেই প্রতিমাসমূহের যথার্থ স্বরূপের ন্যায় সৎকার পূজা ধূপ-দীপ আদি করা এবং পূজা তথা দর্শনাদিতে পরমার্থ সিদ্ধি ও মুক্তি বলে মনে করে তা ঠিক নয়, কেননা এটি শ্রুতি - স্মৃতি উভয়ের বিপরীত যে বিদ্যা ও আত্মজ্ঞান ছাড়াই মুক্তি হতে পারে । হ্যাঁ , সেই প্রতিমাসমূহকে দেখে সেই ব্যক্তিদের গুণ - কর্মের স্মরণ করে আপনারাও তেমন গুণ - কর্মকে ধারণ করবেন যেন উত্তম বলে কথিত হয় ।

- মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী (সম্বৎ ১৯৩৮)

[পত্র ও বিজ্ঞাপন, ২য় ভাগ, পত্র ৫৭৯, পৃষ্ঠা ৬৪১]

শাস্ত্রার্থ আয়োজনের সর্বমান্য নিয়ম তথা শাস্ত্রার্থ কলাকৌশলে নিপুণ হওয়ার বীজমন্ত্রসমূহ

তর্কের মাধ্যমে, সত্যাসত্যের বিচারের মাধ্যমে ধর্ম-সিদ্ধান্ত নির্ণয় একমাত্র বৈদিক সনাতন ধর্মই নির্দেশ দিয়েছে । শাস্ত্রার্থ পরম্পরা সনাতন ধর্মের এক অনন্য পরম্পরা ।

শাস্ত্রার্থ তিন প্রকার হয়ে থাকে – বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা

শাস্ত্রার্থের অধ্যক্ষ হতে হবে শ্রোতাগণের উপর প্রভাবকারী এবং সর্বনিয়ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ । শাস্ত্রার্থে জয়-পরাজয়ের নির্ণয় সদা জনতা-শ্রোতাগণের অধিকারে রাখতে হবে । কারণ শাস্ত্রার্থের একটি উদ্দেশ্য জনতার মধ্যে সত্যাসত্য বোধ করানো ।

পক্ষ তথা প্রতিপক্ষের নিয়ম ন্যায়দর্শনে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে । শাস্ত্রার্থে অসীম পারদর্শী হতে হলে ন্যায়দর্শন হৃদয়াঙ্গম করা অতি আবশ্যক ।

ন্যায়োক্ত শাস্ত্রার্থ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হল —

বাদ

' প্রমাণ, তর্ক, সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহো বাদঃ।”

[ন্যায় দর্শন. ১।২।১]

অর্থাৎ সঠিক প্রমাণ এবং তর্কের মাধ্যমে স্বীয় পক্ষ স্থাপন করা বিপক্ষীর উপালভ্য (খণ্ডন) করা, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ না হওয়া, পঞ্চ অবয়ব দ্বারা যুক্ত পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের গ্রহণ করে যে কথোপকথন হয় তা ‘বাদ‘ নামে খ্যাত ।

‘প্রতিজ্ঞা হেতুদাহরণোপনয়ন, নিগমান্যবয়বাঃ ‘ ॥

[ন্যায় দর্শন. ১।২।৩২]

অর্থাৎ, ১. প্রতিজ্ঞা (সাধ্য) ২. হেতু (সাধনা) ৩. উদাহরণ ৪. উপনয় ৫. নিগমন এই পঞ্চ ‘অবয়ব‘ শাস্ত্রার্থ (বাদ) ।

জল্প

"যথোক্তোপপন্নশ্ছল জাতি নিগ্রহ স্থান সাধ্নোপালম্ভে জল্পঃ"

[ন্যায়দর্শন. ১।২।২]

অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা আদি দ্বারা যুক্ত ছল জাতি এবং নিগ্রহস্থান দ্বারা খণ্ডন-মণ্ডন "জল্প" ।

“ছল” ? -" বচন বিধাত্যোর্থেপপত্যাছলম্”।

[ন্যায়দর্শন. ১।২।৫১]

অর্থাৎ বক্তার ভাব-বিরুদ্ধ কল্পনা করে বক্তার পক্ষে আক্ষেপ করা ছলের অন্তর্গত । বাক্ ছল, উপচার ছল আদি অনেক প্রকার ছল ন্যায় দর্শনে বর্ণিত হয়েছে ।

উদাহরণস্বরূপ, "জাতিঃ " সাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ।

[ন্যায়দর্শন. ১।২।৫৯]

অর্থাৎ বিবাদ করা এবং সব নিয়মের উপেক্ষা করাকে “‘জাতি” বলে ।

“নিগ্রহ স্থান”– বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহ স্থানম্ ।

[ন্যায়দর্শন. ১।২।৬০]

অর্থাৎ বক্তার মূল বক্তব্যকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করা এবং বিবাদ করা “নিগ্রহ" স্থানের অন্তর্গত । জাতি এবং নিগ্রহস্থানের বিবিধ প্রকার বর্ণনা হয়েছে ন্যায় দর্শনে ।

“হেত্বাভাসঃ” ? – যা হেতু হিসেবে গৃহীত হয় পরন্তু সাধ্য এর নিয়ম বহির্ভূত, তা হেত্বাভাস । যথা - "সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম, কালতীতা হেত্বাভাসঃ"।

[ন্যায়দর্শন.১।২।৪৫]

অর্থাৎ সব্যভিচার অর্থাৎ অনৈকান্তিক, অতিব্যাপ্তি, বিরুদ্ধ প্রকরণসম, সাধ্যসম, অতীত কাল এগুলো " হেত্বাভাস" এর অন্তর্গত ।

বিতণ্ডা

"স প্রতিপক্ষস্থাপনা হীনো বিতণ্ডা" ।

[ন্যায়দর্শন.১।২।৪৪]

অর্থাৎ প্রতিপক্ষ, পক্ষ স্থাপন বিনাই বিবাদ করলে তা বিতণ্ডা ।

শাস্ত্রার্থ দুই প্রকারের – (১) সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য (২) কেবল জয়-পরাজয়ের জন্য ।

অধ্যক্ষ

শাস্ত্রার্থে উত্তম অধ্যক্ষ নির্বচন করতে হবে, যার বাকশৈলী জনতার উপর প্রভাব পড়বে, প্রবন্ধে হতে হবে নিপুণ, পক্ষপাত রহিত, পরন্তু তার নির্ণয় করার অধিকার নেই । নির্ণয় তো জনতা-শ্রোতাগণ করবে । জনতাও প্রত্যক্ষ নির্ণয় দিতে পারবে না ।

গ্রন্থ

শাস্ত্রার্থ যে বিষয়ে হবে সেই বিষয়ের প্রমাণিক গ্রন্থরাজি সাথে রাখতে হবে ।

প্রমাণ

শাস্ত্রার্থে প্রমাণ সেসব গ্রন্থ থেকে দিতে হবে যা বিপক্ষীরও মান্য এবং নিজের প্রমাণের পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধি এবং প্রবল যুক্তি থাকতে হবে ।

অসঙ্গতি এবং প্রকরণ বিরুদ্ধতা

শাস্ত্রার্থে মুখ্য প্রসঙ্গ দূরে রেখে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া "অসঙ্গতি এবং প্রকরণ বিরুদ্ধতা" এর নির্দশন । এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ।

শাস্ত্রার্থ আয়োজনের সর্বমান্য নিয়ম

১. শাস্ত্রার্থ উভয় পক্ষের মন্তব্য তথা অমন্তব্যের "সত্যাসত্য পরীক্ষা করার জন্য হয়ে থাকে, দু'পক্ষের বক্তার বিদ্যাবত্তা নির্ণয়ের জন্য নয়" । এজন্যে ইহা স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য শাস্ত্রার্থ সেই ভাষাতেই করা আবশ্যক যে ভাষা শ্রোতাগণ সরলতার মাধ্যমে বোধগম্যে সমর্থ, ব্যাখ্যান যে ভাষাতে প্রদান করা হয়ে থাকে সেই ভাষাতেই শাস্ত্রার্থ হওয়া আবশ্যক । যে ভাষা দ্বারা নিত্য ব্যাখ্যান হয়ে থাকে, তদ্ব্যতীত শাস্ত্রার্থের আয়োজন ভিন্ন ভাষায় করা অনাবশ্যক, অনুপযুক্ত, অযৌক্তিক এবং দুরাগ্রহ মাত্র ।

সুতরাং যে ভাষাতে সচারচর ব্যাখ্যান দেওয়া হয়, অর্থাৎ যে ভাষা শ্রোতাগণের বোধগম্য, সেই ভাষাতেই শাস্ত্রার্থের আয়োজন হবে । কেননা শাস্ত্রার্থের মূল উদ্দেশ্য'র একটি হলো শ্রোতাগণকে শোনানো, বুঝানো তথা তাদের উপর সত্যাসত্য প্রকট করার জন্য ; শাস্ত্রার্থ কর্তার যোগ্যতা প্রদর্শন করার অথবা তার যোগ্যতার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নয় ।

২. শ্রোতাগণের সমক্ষে শাস্ত্রার্থ কেবল মৌখিকভাবে হতে হবে ।

৩. শাস্ত্রার্থের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা তথা বক্তাগণের বিষয়ান্তর প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার বাধা প্রদানে তথা শ্রোতাগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক ।

৪. যে পক্ষ যেসব গ্রন্থকে প্রামাণিক মানে, সেই পক্ষকে সেসব গ্রন্থ থেকে প্রমাণ দিতে হবে ।

৫. একটানা তিন ঘণ্টার অধিক শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠান হওয়া যাবে না, প্রথম ধাপে ১৫-১৫ মিনিট করে তথা পরবর্তী ধাপে ১০-১০ মিনিট করে উভয়পক্ষ সময় নিবে, খুব প্রয়োজন হলে অন্তিম ধাপে ১৫-১৫ মিনিট করে বক্তব্য রাখার সময় নির্ধারণ করতে হবে ।

৬. "অধ্যক্ষ" শাস্ত্রার্থের বিষয়ে কোনো প্রকার কোনো মতামত দিতে পারবে না , অধ্যক্ষ কেবল আবশ্যকতানুসারে ধন্যবাদ তথা সভা প্রারম্ভ তথা সমাপ্তির বচন দিবেন । শ্রোতাগণ যেনো কোনও অসভ্যতা তথা অশিষ্টাচার ব্যবহার না করে, হট্টগোল না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

৭. উভয়পক্ষের শাস্ত্রার্থকর্তা পরস্পর সভ্যতার সহিত বাক্য প্রয়োগ ব্যবহার করে এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ যেনো না করে ।

৮. উভয়পক্ষের সম্মাননীয় মহানুভাবগণের নাম শিষ্টতা এবং সম্মানের সহিত প্রয়োগ করবে তথা অপমানজনক শব্দ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

শাস্ত্রার্থ কলাকৌশলে নিপুণ হওয়ার বীজমন্ত্র

১. শাস্ত্রার্থের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে । যুদ্ধ আজও হতে পারে কিংবা কয়েক বর্ষ পরেও হতে পারে, পরন্তু সৈনিক সর্বদা যুদ্ধাভ্যাসে রত থাকে, শাস্ত্রার্থীদের স্মরণে রাখতে হবে "অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা" ।

২. অনেক তথ্য-উপাত্ত কণ্ঠস্থ রাখতে হবে, গ্রন্থ কেবল প্রমাণের নিমিত্তে সংগ্রহে রাখতে হবে । স্মরণে রাখতে হবে "পুস্তকস্থা যথা বিদ্যা, পরহস্তগতং ধনম্ । কার্য কালে চ সম্প্রাপ্তে, ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্ ॥"

৩. বিপক্ষীর প্রত্যেক প্রশ্ন-উত্তর-আক্ষেপ বা প্রমাণ নোট করতে হবে, তার বক্তব্য সাবধানে শুনতে হবে এবং পয়েন্ট আকারে নোট করতে হবে ।

৪. অনাবশ্যক কথাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে হবে, এসবে অধিক সময় নষ্ট করা যাবে না ।

৫. আবশ্যক বিষয় প্রমাণের সহিত অবশ্যই বলতে হবে ।

৬. শাস্ত্রার্থে অধিক-বিস্তার বক্তব্য রাখা সফলে বাঁধা প্রদান করে । অতঃ বিপক্ষী মতের খণ্ডন এবং স্বীয় সিদ্ধান্তের মণ্ডন সংক্ষেপে হতে হবে, পরন্তু অধিক সংক্ষেপ নয় ।

৭. শাস্ত্রার্থ কর্তার নিকট প্রবল যুক্তি এবং প্রমাণের সমুদ্র থাকতে হবে ।

৮. যে বিষয়ে শাস্ত্রার্থের আয়োজন হবে সেই বিষয়ে স্বীয় পক্ষ তথা বিরোধী পক্ষের মান্যতার পক্ষে প্রচুর জ্ঞান রাখতে হবে ।

৯. যখন শাস্ত্রার্থের আয়োজন নির্ধারিত হবে তখন শাস্ত্রার্থের বিষয়ে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হবে ।

১০. স্বীয় সঙ্গীসাথিদের সাথে বিচার-বিনিময় করা, আবশ্যক বিষয় জিজ্ঞাসা করা তথা যে কোনো তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আলোচনা করতে কখনও সঙ্কোচবোধ করা যাবে না ।

১১. অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ এবং প্রবল যুক্তি তথা প্রমাণ সমূহের সূচি প্রস্তুত করে পয়েন্ট আকারে বা নিজের সুবিধামতো চিহ্ন আকারে ছোট প্যাড বা নোটবুকে লিখিত আকারে রাখতে হবে এবং সেটি নিজের কাছে সর্বদা রাখতে হবে । সাথে যেসব পুস্তক থেকে প্রমাণ নোট করা হয়েছে সেই পুস্তকরাজির প্রমাণ চিহ্ন আকারে, পৃষ্ঠা নাম্বার, প্রকাশনীর নাম লিখে রাখতে হবে ।

১২. শাস্ত্রার্থ কর্তার সহযোগী, যিনি প্রমাণ মূল পুস্তক থেকে বের করবেন তাকে প্রথমে সমস্ত প্রমাণ দেখে নিতে হবে এবং স্মরণে রাখতে হবে ।

১৩. শাস্ত্রার্থে যে গ্রন্থ থেকে প্রমাণ দেওয়া হবে তখন সেই গ্রন্থ সমক্ষে রাখতে হবে । যে গ্রন্থ নিজের কাছে নাই অথবা যে প্রমাণের সঠিক পাতা সম্বন্ধে জ্ঞাত নেই, তার প্রমাণ দেওয়া পরাজয়ের কারণ ।

১৪. শাস্ত্রার্থ কর্তার কোনো অবস্থাতেই ক্রোধান্বিত হওয়া যাবে না ।

১৫. শাস্ত্রার্থ করার জন্য তাকেই নির্ধারণ করতে হবে অথবা তার সাথেই করতে হবে, যার নিকট প্রমাণরাজির সাগর বিদ্যমান, যার নিকট প্রবল যুক্তির বাহুল্য রয়েছে, যার নিকট তাৎকালিক বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রাচুর্যতা রয়েছে, যে প্রত্যুৎপন্নমতি, যে স্বীয়পক্ষ তথা বিপক্ষীর মান্যতা সম্বন্ধে প্রবল জ্ঞাত ।

১৬. বক্তার বচন মিষ্ট, শিষ্টাচার বিশিষ্ট, বল, তেজস্বী, চমৎকার, রোচকপূর্ণ, প্রভাবপূর্ণ হতে হবে, খণ্ডন-মণ্ডন তথা প্রশ্ন করার সময় অনেক মনোরঞ্জক বাক্য শৈলীর প্রয়োগের অভ্যাসী হতে হবে ।

১৭. প্রারম্ভিক উপক্রম এবং অন্তিম ধাপের উপসংহার অত্যন্ত প্রভাবোৎপাদক হতে হবে।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর গোরক্ষা বিষয়ে প্রবচন

মহর্ষি দয়ানন্দ সম্পর্কে ভজনোপদেশকগণ বলেন,

ঈস সংসার ম্যায় মহাপুরুষ, বহুত আতে হ্যায়।
দেব দয়ানন্দ জেসা জীবন, না দেখ পাতে হ্যায়।
অর্থাৎ- এ সংসারে তো অনেক মহাপুরুষেরই আবির্ভাব হয় কিন্তু ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো এত মহত্ত্বপূর্ণ জীবন দেখা যায় না ।

মহর্ষি তাঁর স্বল্প কার্যকালে যা যা করে গিয়েছেন, সেসবকে প্রকাশ করার জন্য শুধু অসাধারণ শব্দটি পর্যাপ্ত নয়। তাঁর প্রতিটি কাজ জনকল্যাণের জন্য সমর্পিত ছিল। বিশেষত অবনত ভারতবর্ষকে উন্নত করাকে মহর্ষি নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই মহর্ষি দেশের মহা অবনতি দেখে কিভাবে চুপ থাকতে পারতেন ?

দেশের অবনতিতে ঋষিবর কতোটা ব্যাতীত ছিলেন তা তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়।

"একদিন মহর্ষি বসে থাকতে থাকতে কিছুক্ষণ পরে শুয়ে পড়লেন । হঠাৎ উঠে বসলেন এবং ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন বিধবা আর গাভীদের অভিশাপে এই দেশ নষ্ট হয়েছে । "
[পণ্ডিত লেখরাম কৃত, জীবনচরিত্র- মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী / পৃষ্টা ৫৯৩]

মহর্ষি ছিলেন একজন আপাদমস্তক কর্মবীর। গোরক্ষার বিচার শুধুমাত্র মনে মনে কিংবা কাগজে কলমে লিখে রাখার মতো ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। আর সেটা ছিলেন না বলেই গোরক্ষার মহান আন্দোলন শুরু করেন। শিখরা গোরক্ষার জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু সেটি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এটিকে আমরা বিদ্রোহ বলেই গণ্য করব । কারণ আন্দোলন হলো এমন কোনো কার্যক্রম যা বৃহৎ পরিসরে জনমানসকে আন্দোলিত করে তোলে। এবং যে কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়। মহর্ষি গোরক্ষাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা তৎপূর্বে কোনও মহাপুরুষ করতে পারেন নি। মহর্ষির এই আন্দোলন ফলপ্রসূও হয়েছিল। এজন্য ভারতবর্ষে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীই গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত হন।

মহর্ষির কার্যক্রমের পরিধি এতদূর ছিল যে তা একটি ছোট প্রবন্ধে বর্ণনা করা বেশ কঠিন। তাও তথ্যপ্রমাণ সহ কিছু লিখার চেষ্টা করবো-

মহর্ষিই যে গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক এ বিষয়ে তাঁর অন্যতম আদি জীবনী লেখক শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় লিখেছেন,

" এতদ্দেশে স্বামী দয়ানন্দই গোরক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক । কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গোরক্ষা লইয়া যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়, তৎসংশ্রবে কয়েকটি ইংরাজও স্বামিজীকেই গোরক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।"

[শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত- দয়ানন্দ চরিত। দ্বিতীয় ভাগ / দ্বাদশ পরিচ্ছেদ / পৃষ্ঠা- ২৮২]

স্বামী সত্যানন্দ জী লিখেছেন,

" গো রক্ষা স্বামীজির অত্যুত্তম কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতবাসীরা গোহত্যাকে চরম ঘৃণা করেন। কিন্তু কোনো সভা সংগঠিত করে গোরক্ষা করার ব্যাবস্থা সর্বপ্রথম শ্রী স্বামীজি মহারাজই জাগ্রত করেছিলেন । তৎপূর্বে অন্য কোন পুরুষ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি ।

[স্বামী সত্যানন্দ কৃত, শ্রীমদ্দয়ানন্দ-প্রকাশ । রাজস্থান কাণ্ড / দ্বিতীয় সর্গ]

গোরক্ষা আন্দোলনের কার্যক্রম-

গোরক্ষার বিষয়ে মহর্ষির প্রভাবশালী বক্তৃতা-

গোরক্ষা আন্দোলনে কার্যক্রম কোনো বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর কোনো প্রচেষ্টায় কমতি ছিল না। গ্রন্থ রচনা, অসংখ্য বক্তৃতা, বিপুল জনসমর্থন অর্জন, এবং একের পর এক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদিতে মহর্ষি অনন্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। যদি আমরা বক্তৃতার বিষয়ে বলি তাহলে বলতে হয়, মহর্ষির মতো অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ ইতিহাসে দুর্লভ। মহর্ষির জীবনচরিত্রের অধ্যয়নকারী মাত্রেই তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি যে বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন সে বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরাও তাঁর সাথে একমত হয়ে যেতেন। প্রসঙ্গত, শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন

" স্বামীজির ব্যাখ্যান এক অপূর্ব সামগ্রী। যে ব্যক্তি তাঁহার ব্যাখ্যান একবার শুনিতেন তিনি বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।"

এরকম অপূর্ব বক্তা মহর্ষি যে গবাদি পশু রক্ষার বিষয়ে প্রচুর জনমত তৈরি করবেন। এ বিষয়ে সন্দেহ কি? মহর্ষি নিজের অপূর্ব বাগ্বিন্যাস এবং অকাট্য যুক্তিতর্ক দ্বারা গোরক্ষার উপকারিতা জনসাধারণের কাছে এমনভাবে প্রচার করেন যে তারা গোরক্ষার উপযোগিতা বুঝে গোরক্ষার সমর্থক হয়ে যায়।

মহর্ষির বক্তব্য, ব্যাখ্যানাদির বর্ণনায় স্বামী সত্যানন্দ জী লিখেছেন,

" স্বামীজি মহারাজ গো-রক্ষা বিষয়ে শতাধিক প্রভাবশালী ব্যাখ্যান দিয়েছিলেন। হাজার হাজার মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের গাভীর মহত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন ।"

[স্বামী সত্যানন্দ কৃত, শ্রীমদ্দয়ানন্দ-প্রকাশ। রাজস্থান কাণ্ড / দ্বিতীয় সর্গ]

" স্বামীজি মহারাজের প্রতিদিন ব্যাখ্যান হতো। হাজার হাজার মানুষ বক্তৃতা শুনতে আসতো। কালেক্টর আদি রাজকর্মচারীগণও তদুপলক্ষে সম্মিলিত হতেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন। স্বামীজির ভাষণের প্রভাব বর্ণনাতীত হতো।

ব্যাখ্যানে গো-রক্ষার লাভ বর্ণন করে স্বামীজি মহারাজ বলেন,

" গো হত্যার কারণে এতো ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজপুরুষ গণ এই বিষয়ে কোনো মনোযোগ দেন না । এই দোষ আমাদেরই বেশি। আমাদের মধ্যে একতার বড়ো অভাব । যদি আমরা সবাই মিলে গো হত্যা বন্ধ করানোর জন্য নিবেদন করি তাহলে কেন তা হতে পারে না? "
[শ্রীমদ্দয়ানন্দ-প্রকাশ । সংগঠন কাণ্ড / দশম সর্গ পৃ০- ৪২২]

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

" বোম্বাইস্থ আর্য্যসমাজের উদ্যোগে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। সেই মহাসভা মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ গোরক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক তেজস্বিনী বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া বোম্বাইয়ের অধিবাসিবর্গ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমনকি সেই বক্তৃতাই তৎপ্রদেশে গোরক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত করিল। "
[দয়ানন্দ চরিত । দ্বিতীয় ভাগ / দ্বাদশ পরিচ্ছেদ / পৃষ্ঠা- ২৮৫]

পণ্ডিত ঘাসীরাম জী লিখেছেন–

" স্বামীজি মহারাজের ব্যাখ্যান গোরক্ষা বিষয়ে হয়েছিল যেখানে তিনি বলেছিলেন, যদি একটি মোটাতাজা গোরুকে হত্যা করা হয় তাহলে এর মাংসের দ্বারা মাত্র ২০ জন মানুষের উদরপূর্তি হতে পারে, তাও তা তখনই সম্ভব যখন এর মধ্যে ১০ সের অন্ন মেশানো হবে । কিন্তু তাকে রক্ষা করা হলে এক বৎসরে ১৮০০০ সের দুধ দিবে, তাতে ৫ সের প্রতি মন চাল দিয়ে খাবার তৈরি করলে ২০,২৫০ জন লোকের একবার তৃপ্তি হতে পারে। এছাড়াও এর যে সন্তান উৎপন্ন হবে, তারা গাভী হলে তাদের থেকে উত্তরোত্তর লাভ হতেই থাকবে। ষাঁড় হলে কৃষিকাজে ব্যাবহৃত হয়ে হাজার হাজার মানুষের খাবারের ব্যাবস্থা করবে ।

" দেশে হাজারো গোরুকে প্রতিদিন হত্যা করা হয় যার কারণে দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হয়ে চলেছে। এর কারণেই এই দেশ দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের শাসকরা এর উপর কোনও মনোযোগ দেয় না। কিন্তু এখানে শুধু শাসকেরই অপরাধ নয় আমাদেরও অপরাধ আছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ নই একারণে উক্ত ক্ষতি হয়ে চলেছে। যদি সবাই মিলে সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন করি তাহলে কি গোহত্যা বন্ধ হতে পারে না? "

[পণ্ডিত ঘাসীরাম কৃত, " মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন-চরিত। দ্বিতীয় ভাগ/ চতুর্বিংশ অধ্যায় / পৃষ্টা ৫৭১]

মহর্ষি দয়ানন্দের গোরক্ষা উদ্যোগ - গোরক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম

সরকারের কাছে গোরক্ষার জন্য প্রার্থনা পত্র প্রেরণের উদ্যোগ-

সেসময় গোহত্যা ইংরেজদের দ্বারা সমর্থিত ছিল। তাদের অনেকগুলো কসাইখানাও ছিল যেখানে প্রতিদিন বহু গোরুকে হত্যা করা হতো। মহর্ষি নিজের গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানে ইংরেজদেরকে কিভাবে গোরক্ষার লাভ বুঝিয়েছিলেন তা আগে লিখেছি। তবে এককভাবে যত ইংরেজদের বোঝান না কেন, যদি এ বিষয়ে কোনও সরকারি আইন না থাকে তাহলে গোহত্যা বন্ধ হওয়ার কোনো আশা নেই। সুতরাং ঋষি দয়ানন্দ ইংরেজ সরকারের মাধ্যমেই গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করানো যুক্তিসংগত বলে মনে করলেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায় তিনি গো রক্ষার সমর্থনে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর নিয়ে সরকারের কাছে প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

যেন তারা অবাধ গোহত্যার উপর শীঘ্রই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ বিষয়ে পণ্ডিত ঘাসীরাম জী লিখেছেন,

“ স্বামীজি মহারাজ শেষে চিন্তা করলেন যে, যদি তিন কোটি ভারতবাসীর স্বাক্ষর সংযুক্ত; একটি প্রার্থনাপত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রেরণ করা হয়, তাহলে গোহত্যা বন্ধ করা সম্ভব। এই চিন্তা থেকে চৈত্র কৃষ্ণ ৯ সম্বৎ ১৯৩৮ এ বোম্বাই থেকে একটি বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করেন যাতে গোরক্ষার লাভ এবং হত্যার ক্ষতি দেখিয়ে তৈরীকৃত প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করেন। এটি আর্যসমাজের সকল শাখা এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা মহারাজ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রেরণ করে জোরদার কার্যক্রম শুরু করেন। শোনা যায় যে স্বামীজি মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজে বিলাত গিয়ে নিজের হাতে উক্ত প্রার্থনাপত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দিবেন। স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য আর্যসমাজীরা খুবই উৎসাহের সাথে কাজ শুরু করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর করানো হচ্ছিল। কিন্তু অক্টোবর সন্ ১৮৮৩ এ স্বামীজি মহারাজের দেহান্ত হয়ে যায়। ফলে উক্ত প্রার্থনাপত্র আর পাঠানো হয়নি। সব শ্রম বিফল হয়ে পড়ে থাকে।”

[পণ্ডিত ঘাসীরাম কৃত ‘ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন-চরিত। দ্বিতীয় ভাগ / সপ্তবিংশ অধ্যায় / পৃষ্টা- ৬৬৭]

মহর্ষি স্বাক্ষরের জন্য যে প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তা নিম্নরূপ-

জগতে এমন কোন মনুষ্য আছেন যিনি সুখলাভে প্রসন্ন এবং দুঃখ প্রাপ্তিতে অপ্রসন্ন না হইয়া থাকেন। যেরূপ অন্যের উপকার গ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণ স্বয়ং আনন্দিত হইয়া থাকেন সেরূপ অন্যের উপকার করিয়া অবশ্যই সুখী হওয়া উচিত। এমন কোনো বিদ্বান সংসারে আছেন বা হইবেন কি ?

যিনি পরোপকাররূপ ধর্ম এবং পরহানি রূপ অধর্মের কথা ছাড়িয়া ধর্মাধর্ম সিদ্ধ করিতে পারিবেন।সেই মহাশয়গণ ধন্য, যাঁহারা আপন তনু, মন এবং ধনের দ্বারা সংসারের উপকার করিয়া থাকেন। তাহারা নিন্দনীয় মনুষ্য যাহারা নিজ অজ্ঞানতার কারণে স্বার্থপরবশ হইয়া স্বীয় তনু, মন এবং ধনের দ্বারা পরহানি করিয়া বৃহৎ লাভের নাশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টিক্রমের দ্বারা ঠিক ঠিক এই নিশ্চয় হয় যে পরমেশ্বর যে যে বস্তু রচনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ উপকার গ্রহণের জন্যই করিয়াছেন, অল্প লাভ করিয়া মহাহানি করিবার জন্য নহে।

জীবনের মূল দুই প্রকারের, প্রথম অন্ন , দ্বিতীয় পানীয়। উক্ত অভিপ্রায়ে আর্যাবর্ত শিরোমণি রাজামহারাজ এবং প্রজাগণ গাভী আদি পশুকে না তো নিজে মারিতেন না অপরকে মারিতে দিতেন। এখনও এই গাভী, ষাঁড় এবং মহিষ আদি পশুকে হত্যা করা কিংবা করিতে দেওয়া উচিত নহে। কেননা অন্ন এবং পানীয় বহু প্রকারে ইহাদের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা সবার জীবনে সুখ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাদের মারিলে রাজা ও প্রজার যতটা হানি হইয়া থাকে ততটা অন্য কিছুতে হয় না। এই সিদ্ধান্ত 'গোকরুণানিধিঃ' পুস্তকে উত্তমরূপে প্রকট করিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ এক গাভীকে হত্যা করিলে বা করাইলে চার লক্ষ বিশ হাজার মনুষ্যের সুখের হানি ঘটিয়া থাকে।

এইজন্য আমরা সবাই স্বপ্রজার হিতৈষিণী রাজরাজেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার ন্যায়প্রণালীতে যেরূপ অন্যায়ভাবে পরম উপকারক গাভী আদি পশুর হত্যা হইতেছে । ইহাকে এই রাজ্য হইতে প্রার্থনাপূর্ব্বক বন্ধ করাইয়া প্রসন্ন হইবার ইচ্ছা করি। ইহা আমাদের বিশ্বাস যে বিদ্যা, ধর্ম এবং প্রজাহিতপ্রিয় শ্রীমতি রাজরাজেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া পার্লামেন্ট সভা এবং সর্বোপরি প্রধান আর্য্যাবর্ত্তীয় শ্রীমান গবর্নর জনরল সাহেব বাহাদুর সম্প্রতি গাভী , মহিষ এবং ষাঁড় আদির হত্যার ন্যায় হানিকারক কর্ম রোধ করিয়া তথা উৎসাহ এবং প্রসন্নতাপূর্বক শীঘ্র বন্ধ করাইয়া আমাদেরকে আনন্দিত করিবেন। দেখুন , উক্ত গুণযুক্ত গবাদি পশুকে মারিলে বা মারাইলে দুগ্ধ, ঘৃত এবং কৃষকগণের হানি হইয়া থাকে। এরূপে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই হানি হইতেছে এবং প্রতিনিয়ত অধিক হইতে অধিকতর হানি হইয়া চলিতেছে ।

কেউ পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া যখন বিচার করিবেন তখন পরোপকারকে ধর্ম এবং পরহানিকে অধর্ম বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিবেন। যাহা যাহা হইতে অধিক উপকার হইবে তাহার পালন করা, বর্ধন করা এবং কদাপি নাশ না করা; ইহা কি বিদ্যার ফল এবং সিদ্ধান্ত নহে? পরম দয়ালু ন্যায়কারী, সর্বান্তর্যামী, সর্বশক্তিমান পরমাত্মা এই জগদুপকারক কর্ম করিতে সমস্ত রাজা প্রজাদিগকে একমত করুন।

[হস্তাক্ষর]

[তথ্যসূত্র-শ্রী পণ্ডিত লেখরাম জীর উদ্ধৃতি, জীবনচরিত্র - মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী/ পৃষ্টা- ৮৫৩-৫৪]

উক্ত প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞাপন -

উক্ত প্রার্থনাপত্রে সবাই যেন স্বাক্ষর করে এই উদ্দেশ্যে, চৈত্র কৃষ্ণ ৯ সংবৎ ১৯৩৯; তদানুসারে ১৪ মার্চ সন্ ১৮৮২ এ বোম্বাই থেকে মহর্ষি নিম্মোক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন -

❝ বিজ্ঞাপনপত্রমিদম্- আর্যপুরুষগণকে জানানো হইতেছে যে, যেই পত্রের উপরে (ओ३म्) এবং নিচে (হস্তাক্ষর) এরূপ চিহ্ন আছে তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য।

ইহাতে এই প্রকারে সাক্ষর করিতে হইবে -

যাহার স্বরাজ্য বা দেশে ব্রাহ্মণ আদি মনুষ্যের সংখ্যা যতো আছে ততো লিখিয়া; শত, সহস্র, লক্ষ বা কোটি সংখ্যক মনুষ্যের পক্ষ হইতে আমি অমুকনামা পুরুষ স্বাক্ষর করিতেছি লিখিবেন । এই প্রকারে একজন, শ্রীযুত মহাশয় প্রধান পুরুষের স্বাক্ষরের মাধ্যমে সর্বসাধারণ আর্যপুরুষগণের স্বাক্ষর হইয়া যাইবে । যতো মনুষ্যের পক্ষ হইতে একজন মুখ্য ব্যক্তি সাক্ষর করিবেন তিনি তাহাদের স্বাক্ষর করাইয়া অবশ্যই নিজের কাছে রাখিবেন ।

যেসকল মুসলমান ও খ্রিস্টানগণ এই মহা উপকারক বিষয়ে দৃঢ়তা এবং প্রসন্নতাপূর্বক স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা করিয়া দিন । ইহাতে আমার আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পরম উদার মহাত্মাগণের পুরুষার্থ, উৎসাহ এবং প্রীতির মাধ্যমে এই সর্বোপকারক, মহাপুণ্য এবং কীর্তিপ্রদায়ক কার্য যথাবৎ সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

– দয়ানন্দ সরস্বতী (বোম্বাই) ”

[তথ্যসূত্র-শ্রী পণ্ডিত লেখরাম জীর উদ্ধৃতি, জীবনচরিত্র - মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী/ পৃষ্টা- ৮৫৩-৫৪]

সমগ্র ভারতবর্ষে গোরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ-

মহর্ষির ভক্ত এবং শিষ্য রামানন্দ ব্রহ্মচারী, মহাশয় রুপসিংহকে পাঠানো একটি পত্রে লিখেছেন -

“ যেহেতু আপনি গোরক্ষা সম্পর্কিত পত্র লিখেছেন, তাই আমি যখন আপনার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলাম, তখন লাহোর আদি স্থানে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর্যাবর্তের ভেতরে এমন কোনো প্রদেশ বাকি নেই, যেখানে দুই-চার স্থানে পত্র পাঠানো হয়নি। আর যে যে স্থানের কথা নতুন করে জানা যাচ্ছে, সেখানে এখনও পাঠানো হচ্ছে। এসবের কারণ এই যে, ডাক-পিয়নরা এই অনর্থ করেছে। যেমন এই বিষয়ে আপনার পত্র এসেছে, তেমনি আরো কয়েকজন মহাশয়ের পত্র এসেছে যে, তাঁদের কাছে পত্র পৌঁছে গেছে, কিন্তু গোরক্ষা সম্বন্ধিত মেমোরিয়াল (ফর্ম) যায়নি। পুনরায় সেই মহাশয়দের কাছে তা পাঠাতে হয়েছে।...আপনি যদি খুশিমনে স্বীকার করেন তবে আমি আপনাকে আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি আগে ঘুরার জন্য যেভাবে দুই মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন সেভাবে যদি পুনরায় দুই এক মাসের ছুটি নিয়ে পাঞ্জাব হাথা, পটিয়ালা এবং কাশ্মীর আদি ভালো ভালো জায়গায় গো হত্যার ক্ষতি বিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে বড়, বড় প্রধান শ্রেণীর রাজপুরুষ তথা রাজা-মহারাজদের গোরক্ষার জন্য সাক্ষর করান তবে আপনি আর্যাবর্তে সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠা এবং পুণ্যের ভাগীদার হবেন।...আপনার অভিবাদন পরম গুরু স্বামীজিকে জানিয়েছি। আপনিও শ্রী স্বামীজির শুভাশিস গ্রহণ করবেন। ” ভদ্রমস্তু ॥ - রামানন্দ ব্রহ্মচারী

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক কৃত, ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র এবং বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় ভাগ / পূর্ণ সংখ্যা ৬৬৩ / পৃষ্টা- ৬৮২ তারিখ- ১২ ই মে ১৮৮২ ইংরেজি]

গো-কৃষ্যাদি রক্ষিণী সভার স্থাপন

“ স্বামিজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে গোরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত করিয়া এতদ্দেশে গোরক্ষার পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিলেন। ”

[দয়ানন্দ চরিত। দ্বিতীয় ভাগ / দ্বাদশ পরিচ্ছেদ / পৃষ্ঠা- ২৮২]

গোকৃষ্যাদি রক্ষিণী সভার কার্যক্রম কিভাবে চলবে তা মহর্ষি গোকরুণানিধিঃ গ্রন্থে লিখেছেন।

গোরক্ষাহেতু তৎকালীন সময়ে মহর্ষির শিষ্য-ভক্তদের তৎপরতা এবং রাজা মহারাজদের সহযোগিতা

ভারত ভাগ্য বিধাতা ঋষি দয়ানন্দের চেষ্টায় গো-রক্ষার কার্যের জন্য জনসাধারণ থেকে শুরু করে রাজা মহারাজগণ কেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমরা কেবল সেই ব্যক্তিদের নাম এবং তাঁদের দ্বারা সংগৃহীত স্বাক্ষরের উল্লেখ করছি,

১. শাহপুরাধীশ নাহরসিংহ দ্বারা - ৪০,০০০
২. শ্রী গোপালরাও হরি (ফরাক্কাবাদ) - ৭২,০০০
৩. কটিলার ঠাকুরানী মহাশয়া - ৯,৩০৩
৪. জালিমসিংহ (রূপধনী) - ১০,০০০
৫. সেবকলাল কৃষ্ণদাস (বোম্বাই) - ১৫,৩২০
[সংখ্যা ৩-৪ এর পত্রসমূহে উপলব্ধ]

" পণ্ডিত কালুরাম শর্মার চেষ্টায় গোরক্ষার জন্য রাওরাজা সীকরের এলাকার ৫৫৫ টি গ্রাম থেকে চাঁদা উত্তোলন করা হয়েছে। রামগড়, লক্ষ্মণগড়, ফতেপুর ইত্যাদি স্থান থেকেও কিছু টাকা পাওয়া গেছে। "বিপ্র গোপীনাথের পত্র (আংশিক)

[ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র ও বিজ্ঞাপন / তৃতীয় ভাগ / পূর্ণসংখ্যা - ২২৪ / পৃষ্টা- ৩১৮]

এছাড়াও হোল্কর (ইন্দৌর), রতলাম, বীকানের, জেসলমের (পত্র ও বিজ্ঞাপন / ভাগ ৪ পৃ-৬৪৪) জৈপুর, বূন্দী, কোটা আদি রাজ্য থেকে গোরক্ষার জন্য স্বাক্ষর করানো হয়েছিল।

জয়পুরে মহারাজের পক্ষ থেকে গো হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ বিষয়ে পত্রব্যাবহারের উল্লেখ নিম্নরূপ-

৮ এপ্রিল ১৮৮২ তে বোম্বাই থেকে স্বামীজি একটি ইংরেজি পত্র মান্যবর শ্রীমান নন্দকিশোর জীর নামে প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত পত্রের অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো-

" ৪ তারিখ আপনার পত্র পেয়েছি। আনন্দিত হলাম। পণ্ডিত কালুরাম সেখানে সফল হওয়ায় আমি প্রসন্ন হয়েছি ,এটা শুনেও আনন্দিত হয়েছি যে জয়পুরে গো হত্যা বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম চলছে । আমি চাইছি যে এই কার্য কোনো মহারাজের দ্বারা সফলতা প্রাপ্ত হোক। আপনি বাস্তবে অনেক ভালো ব্যাবস্থা করেছেন যে, কোনো গাভী, বলদ বা মহিষকে রাজ্যের বাইরে বিক্রি করা যাবে না । এর অতিরিক্ত সবচেয়ে ভালো উপায় যা আমি বলতে চাইছি তা হলো, গাভীদের সংখ্যা গণনা করা হোক। যেখানে রাজ্যের সমস্ত গাভী, বলদ এবং মহিষ আদির সংখ্যা লিখা হবে এবং সেই কার্যালয়ে তৎসম্পর্কিত প্রত্যেক পশুর জন্ম এবং মৃত্যুর হিসাব লিখা হবে। গাভীদের গণনা প্রতি ছয় মাস পর পর হওয়া চাই। কারণ এর মাধ্যমে রাতে পশুদের চোরাচালান বন্ধ করা যাবে। "

[শ্রী পণ্ডিত লেখরাম জীর উদ্ধৃতি / জীবনচরিত্র। পৃষ্টা- ৮৫৪-৫৫]

" পণ্ডিত কালুরাম জীর জয়পুর যাওয়া সফল হয়েছে । জয়পুরে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। জয়পুরের মহারাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে সেখানে গোহত্যা হবে না । " পূর্ণ সংখ্য - ৩০৩ (পত্র সারাংশ)

৪ এপ্রিল ১৮৮২
নন্দকিশোরসিংহ, জয়পুর ।
[ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র ও বিজ্ঞাপন / তৃতীয় ভাগ পৃষ্টা - ৩৮৪]

তৎকালীন উদয়পুরের মহারাণা সজ্জনসিংহ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং ভক্ত ছিলেন । তিনি গবাদি পশুর হত্যা বন্ধ করার জন্য জোধপুরের মহারাজ যশবন্তসিংহকে একটি চিঠি লিখে পাঠান । এর উত্তরে জোধপুরাধীশ লিখেছিলেন,

" আমার প্রজাদের মধ্যে ১৪, ৬১, ১৫৬ হিন্দু এবং ১,৩৭,১১৯ সংখ্যক মুসলমান আছে। 'তিন পশুকে (গাভী, ষাঁড় এবং মহিষকে) হত্যা করা যাবে না ' এই ব্যবস্থায় তারা খুশি । পৌষ ৫ / সম্বৎ ১৯৩৯।

সাক্ষর

রাজরাজেশ্বর মহারাজাধিরাজ জসবন্তসিংহ, মারওয়াড়, জোধপুর।

[তথ্যসূত্র- ঠাকুর জগদীশসিংহ গহলোত কৃত, রাজপূতানার ইতিহাস। ভাগ ১ পৃষ্ঠা- ২৮৭]

(ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর পত্র ও বিজ্ঞাপন- চতুর্থ ভাগ / প্রাককথন অংশ থেকে উদ্ধৃত)

সনাতন ধর্মে কি সুদ গ্রহণ বা প্রদান করা নিষিদ্ধ ?

বর্তমান সময়ে সুদ ছাড়া ব্যবসায় কল্পনাও করা যায় না। সুদ কোন আধুনিক সময়ের ধারণা নয়, সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই সুদের ব্যবহার চলে আসছে। একটা নির্দিষ্ট মতবাদের কারণে অনেকের মনেই সনাতন ধর্মে সুদ নিষেধ নাকি নেই তা নিয়ে সংশয় উঠেছে৷ আজ সেই সংশয় নিবারণ করবো। শুরুতেই বেদে এই সম্পর্কিত কিছু বলা আছে কিনা তা দেখা যাক! অথর্ববেদে বলা হচ্ছে,

যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তন্মে ভূয়ো ভবতু মা কণীয়োহগ্নে সাতঘ্নো দেবান্ হবিষা নিষেধ।।
-অথর্ববেদ ৩/১৫/৫

অনুবাদ—হে বিদ্বান্ গণ! মূলধন দ্বারা আমি ধন বৃদ্ধির ইচ্ছা করিতেছি। যে ধন দ্বারা বাণিজ্য করিতেছি তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। হে পরমাত্মন্! যাহারা আমার লাভের হানিকারক তাহাদিগকে আমার নিকট হইতে দূরে রাখ।

অর্থাৎ বেদ অনুসারে মূলধন বৃদ্ধির প্রয়াস তথা সুদ/মুনাফা মোটেই নিষেধ নয়। কিন্তু নিষেধ নয় মানে এই না যে চড়া বা অতিরিক্ত সুদ/ মুনাফা ধার্য করা হবে, অবশ্যই এটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখা আবশ্যক।

মনুস্মৃতির ৮/১৪০ এ বলা হয়েছে, ধন বৃদ্ধির ইচ্ছাকারী ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৮০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ১০০ টাকায় মাসিক ১.২৫ পয়সা সুদ নেবে। অর্থাৎ ধন বৃদ্ধির ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তি সর্বোচ্চ অশীতিভাগ অর্থাৎ মাসিক প্রতি ৮০ টাকায় ১ টাকা [১০০ টাকায় ১.২৫ টাকা, বছরে ১০০ টাকায় ১৫ টাকা] সুদ নেবে, এর অধিক নয়।

একই অধ্যায়ের ১৫৫ শ্লোকে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুদ না দিতে পারে তাহলে সে যতটুকু দিতে পারে তা দেওয়া উচিত। অবশিষ্ট সুদ না দিয়ে সেটা মূলধনে পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত।পরাশর সংহিতায় বলছে, সুদে অর্থ বিনিয়োগ করা, স্বর্ণকার হওয়া, গবাদি পশুর পরিচর্যা করা, জমি চাষ করা, ব্যবসায় করা-এসব হলো বৈশ্যদের পেশা। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রেও একই কথা বলা হয়েছে।কিন্তু চড়া সুদ অবশ্যই নিন্দনীয় ও পাপ কাজ। যারা অতিরিক্ত সুদ নেয় তারা উসুরী।

বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, বেদপাঠীদের মধ্যে যারা অল্পমূল্যের সম্পদ অতিরিক্ত মূল্যে প্রদান করে সে হলো উসুরী। বশিষ্ঠ ধর্মসুত্রেই আবার বলা হচ্ছে, অপরাধের মানদণ্ডে একজন ব্রাহ্মণহত্যাকারী শীর্ষে অবস্থান করে এবং একজন উসুরী তার নিচে।

সুতরাং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুদে অর্থ বিনিয়োগ বা সুদ গ্রহন করা কোন পাপকর্ম নয় বরং এটা বৈশ্যদের পেশা হিসেবেই পরিগণিত। তবে অবশ্যই চড়া বা অতিরিক্ত সুদে অর্থ বিনিয়োগ বা প্রদান তথা উসুরীকে সর্বদাই নিকৃষ্ট কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গোরক্ষা আন্দোলন ও মহর্ষি দয়ানন্দ রচিত পুস্তক ‘ গোকরুণানিধিঃ ’

গবাদি পশুর রক্ষার বিচার নিয়ে মহর্ষি গোকরুণানিধিঃ নামক একটি লঘু পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে মহর্ষি গোরক্ষার মূল উপদেশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এ বইটি গোরক্ষা আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হয় । কারণ গোরক্ষা কার্যক্রম বেগবান করতে কিংবা বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষা আন্দোলন জাগিয়ে তুলতেও এই ছোট বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । যারা মহর্ষির প্রবচন শুনেননি তারা এই বইয়ের মাধ্যমেই মহর্ষির মহত্ত্বপূর্ণ বিচারধারা সম্পর্কে অবগত হয়ে গোরক্ষা আন্দোলনে সম্মিলিত হয়েছিলেন । সুতরাং আকারে ছোট হলেও গোকরুণানিধিঃ কে মহর্ষির এক অনন্য রচনা বলে গণ্য করা হয়।

‘গোকরুণানিধিঃ’ তিনটি অধ্যায় বা অংশে বিভক্ত। যথা -

১.সমীক্ষা প্রকরণ
২. হিংসক রক্ষক সংবাদ
৩. গো-কৃষ্যাদি রক্ষিণী সভার নিয়ম উপনিয়ম।

প্রথম সমীক্ষা প্রকরণে মহর্ষি পশুদের রক্ষা করার উপকারিতার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

দ্বিতীয় হিংসক রক্ষক সংবাদ অংশ এই পুস্তকের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে মহর্ষি মাংসভোজী ও পশুহত্যাকারীদের বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডন করেছেন।

তৃতীয় অংশে গোরক্ষার জন্য স্থাপন হওয়া গো কৃষ্যাদি রক্ষিণী সভাসমূহের কার্যক্রম যেন সুচারুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য উক্ত সভার নিয়ম উপনিয়ম ইত্যাদি লিখেছেন।

আজকের আলোচনায় মহর্ষির মহত্ত্বপূর্ণ লিখার কিছু অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তা থেকে গোরক্ষা আন্দোলনের মহত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করব। কিন্তু আপাততঃ গোকরুণানিধিঃ র সামগ্রিক কোনো আলোচনা করবো না।

মহর্ষি গোকরুণানিধিঃ কে যেমন সুন্দর বাক্য বিন্যাসের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তেমনই এখানে দিয়েছেন অপূর্ব সব গাণিতিক যুক্তি। সাধারণ যুক্তি অনেকে এড়িয়ে যেতে পারেন কিন্তু মহর্ষি যে শৈলিতে লিখেছেন তা অস্বীকার করার মতো নয়। মহর্ষির এই যুক্তিসমূহ সমীক্ষা প্রকরণ অংশে লিখিত হয়েছে। সেখান থেকে গোরুর উপকার বিষয়ক অংশ উদ্ধৃত করছি-

" যদি একটি গোরু ন্যূনকল্পে দুই সের দুগ্ধ দেয় এবং অন্য আর একটি গোরু বিশ সের দুগ্ধ দেয় তবে প্রত্যেক গোরু যে গড়ে এগারো সের দুগ্ধ দেয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই হিসাবে প্রতি গোরু এক মাসে সওয়া আট মন দুগ্ধ দিয়া থাকে। যদি একটি গোরু ন্যূনকল্পে ছয় মাস ও অন্য আর একটি গোরু ন্যূনকল্পে ১৮ মাস পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। তাহা হইলে প্রতি গোরুর গড়ে বারো মাস দুগ্ধ হয়। এই পরিমাণের দুগ্ধ জ্বাল দিয়া প্রতি সেরে এক ছটাক চাউল ও দেড় ছটাক চিনি দিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া খাইলে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দুই সের দুগ্ধের পরমান্ন যথেষ্ট হয়। ইহাও গড় পরিমাণের হিসাব। কেহ দুই সের দুগ্ধের অধিক পরমান্ন খাইবে এবং কেহ কম খাইবে। এই হিসাবে একটি প্রসূতা গাভীর দুগ্ধে (১,৯৮০) এক হাজার নয় শত আশী ব্যক্তি একবার তৃপ্ত হইতে পারে। গাভী কম পক্ষে আট বার ও অধিক পক্ষে আঠারো বার সন্তান প্রসব করে। ইহার গড় পরিমাণে তেরো বার হয়।

তাহা হইলে (২৫,৭৪০) পঁচিশ হাজার সাত শত চল্লিশ ব্যক্তি একটি গাভীর সারা জীবনের দুগ্ধে একবার তৃপ্ত হইতে পারে। এই গাভীর প্রথম বংশে যদি ছয়টি বকনা বাছুর ও সাতটি এঁড়ে বাছুর হয় এবং যদি রোগাদি হেতু একটির মৃত্যু হয় তবুও বারোটি বাছুর থাকিবে। উক্ত ছয়টি বকন বাচ্চুর ভবিষ্যতে যে দুগ্ধ দিবে তাহাতে উক্ত প্রকারে (১,৫৪,৪৪০) এক লক্ষ, চুয়ান্ন হাজার, চারশত চল্লিশ ব্যক্তির পোষণ হইতে পারে, বাকি রইলো ছয়টি এঁড়ে বাছুর। তাহাদের মধ্যে প্রতি জোড়ায় দুইটি করিয়া এঁড়ে হইলে প্রতি বৎসর

(কৃষিকার্যে ব্যাবহৃত হয়ে) (২০০) দুই শত মণ চাউল উৎপন্ন করিতে পারে। এই ভাবে তিন জোড়া এঁড়ে (৬০০) ছয় শত মণ চাউল উৎপন্ন করিতে পারে। ইহাদের জীবনের উপযোগী অংশ মধ্য ভাগের আট বৎসর। এই হিসাবে এক জন্মে তিন জোড়া এঁড়ে গোরুতে (৪৮০০) মণ

চাউলে (২,৫৬,০০০) দুই লক্ষ, ছাপান্ন হাজার মনুষ্য একবার ভাত খাইতে পারে। দুগ্ধ ও অন্ন এক সঙ্গে যোগ করিয়া দেখিলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে (৪,১০,৪৪০) চার লক্ষ, দশ হাজার, চারশত চল্লিশ ব্যক্তির একবারের ভোজন ও পোষণ একটি গাভীর দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। এখন ছয়টি গাভীর বংশ পরম্পরার হিসাব কষিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের দ্বারা অসংখ্য মানুষের ভরণ পোষণ হইতে পারে। কিন্তু ইহার মাংস দ্বারা কেবল আশী জন মাংসাহারী একবার তৃপ্ত হইতে পারে। দেখিতে হইবে সামান্য লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বধ করিয়া অসংখ্য মনুষ্যের ক্ষতি করা মহাপাপ কিনা। ”

প্রশ্ন- মহর্ষি দয়ানন্দ সকল প্রাণীকে রক্ষার কথাই বলেছেন কিন্তু গোরুর বিষয়ে এতো বেশি মনোযোগ কেন ?

উত্তর - হ্যাঁ। মহর্ষি সকল প্রাণীর রক্ষার কথা বলেছেন কিন্তু তিনি গোকরুণানিধিতে গোরুকেই সর্বাপেক্ষা সুখদায়ী প্রাণী বলে উল্লেখ করেছেন।

“ যদিও গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ কিছু বেশী হয় এবং মহিষ অপেক্ষা বলদ কিছু কম উপকার করে তথাপি গরুর দুগ্ধ ও বলদ হইতে মনুষ্য যতটা সুখ লাভ করে মহিষের দুগ্ধে ও মহিষ হইতে ততটা হয় না। কেননা, আরোগ্যকর ও বুদ্ধি বর্দ্ধকাদি গুণ গরুর দুগ্ধে ও বলদে যতটা আছে ততটা মহিষের দুগ্ধে ও মহিষাদিতে থাকিতে পারে না। এই জন্য আর্য্যগণ গরুকেই সর্বোত্তম পশু বলিয়া মানিয়াছেন। উষ্ট্রের দুগ্ধ গরুর ও মহিষের দুগ্ধের অপেক্ষাও পরিমাণে বেশী হয় তবুও ইহার দুগ্ধ গরুর দুগ্ধের ন্যায় নহে। ”

এটা মহর্ষির পক্ষপাত নয় । দেখুন লালন পালন, পোষ মানা, শান্ত স্বভাব, প্রভুর উপকার করা সবদিক থেকে অন্যসব গবাদি পশুর চেয়ে গোরুই এগিয়ে সুতরাং আর্য মান্যতা অনুসারে মহর্ষি গোরুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে অভিহিত করেছেন । তাই বলে মহিষাদির পালন পোষণ হবে না তা বলেননি। গোকরুণানিধিঃ তে মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর দ্বারা হওয়া উপকারের কথাও মহর্ষি লিখেছেন। তাছাড়া গোরক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রসঙ্গে মহিষাদি পশুদের রক্ষার উল্লেখও রয়েছে ।

প্রথম পর্বে লিখেছিলাম ইংরেজরা অবাধে গবাদি পশু হত্যার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে কসাইখানার ব্যাবস্থা করেছিল যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার গোরু তথা গবাদি পশুকে হত্যা করা হতো।

এছাড়াও ইংরেজ শাসনামলে দরিদ্র কৃষকের উপর অমানবিক নির্যাতনের কথা কে না জানেন? ইংরেজদের এসব মানবতা বিবর্জিত কুকৃত্যের নিন্দা করে করে মহর্ষি লিখেছেন-

" যদি কোন মনুষ্য ভোজনার্থে উপস্থিত হয় এবং তাহার সম্মুখ হইতে ভোজ্যবস্তু অপসারিত করা হয় ও তাহাকে সেখান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয় তবে কি সে সুখী হইবে? এইভাবে আজকাল গবাদি পশু সরকারী জঙ্গলে গিয়া তাহার ভোজ্য পদার্থ তৃণ পত্রাদি বিনা শুল্কে ভোজন করিলে বা ভোজন করিতে গেলে সেই হতভাগ্য পশুর ও তাহার প্রভুর দুর্দ্দশা ঘটে। জঙ্গলে আগুণ লাগিয়া গেলে কোন চিন্তা নাই কিন্তু ঐ সব পশু যেন সেখানে তৃণাদি ভক্ষণ করিতে না পারে। "

"শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরা শ্রীভিক্টোরিয়া মহারাণীর ঘোষণা বাণীও সর্বজনবিদিত যে এইসব মূক পশুকে যে যে দুঃখ দেওয়া হয় তাহা আর দেওয়া হইবে না। আচ্ছা, হত্যা করা অপেক্ষা কি আর অধিক দুঃখ আছে?"

গবাদি পশু এবং কৃষকদের রক্ষাহেতু; ইংরেজ সরকারকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,

" মনোযোগ দিয়া শুনুন, নিজের যেমন সুখ দুঃখ হয়, অন্যেরও ঠিক সেইরূপই হয় এইরূপ বুঝিতে থাকুন। ইহাও মনে রাখিবেন, পশু, তাহাদের প্রভু, কৃষকদের পশু ও প্রজাগণের অত্যধিক পুরুষার্থ বলেই রাজার ঐশ্বর্য্য অধিক বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের হ্রাস পাইলেই রাজার ঐশ্বর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রজার যথাযথ রূপে রক্ষার জন্যই রাজা তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন । রাজা ও প্রজার সুখের মূল কারণ গবাদি পশুর বিনাশ করা হউক এজন্য নহে। অতএব আজ পর্যন্ত যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ভবিষ্যতে চক্ষু মেলিয়া সকলের ক্ষতিকর কার্য্য করিবেন না এবং অন্যকেও করিতে দিবেন না। হ্যাঁ, আমাদের কর্তব্য, আপনাদের ভালমন্দ সব কার্য্য সম্বন্ধে সচেতন করা এবং আপনাদের কর্তব্য পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সকলের রক্ষা ও উন্নতির জন্য তৎপর থাকা, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদের ও আপনাদের উপর সম্পূর্ণরূপে কৃপা করুন যেন আমরা ও আপনারা বিশ্বের হানিকর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলে আনন্দে থাকি। এই সব কথা শুনিয়া ভুলিবেন না। মনে রাখিবেন এই সব অনাথ পশুদের প্রাণকে শীঘ্রই বাঁচাইতে হইবে। "

এরপর জনসাধারণ এবং সমাজের সজ্জন ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করে মহর্ষি লিখেছেন,

" হে ধর্মপরায়ণ সজ্জনবৃন্দ! আপনারা তনু, মন ও ধন দ্বারা এই সব পশুকে কেন রক্ষা করিতেছেন না? হায়! বড়ই দুঃখের বিষয় যখন হিংসকেরা গরু ও ছাগাদি পশুকে এবং ময়ুরাদি

পক্ষীকে হত্যা করার জন্য লইয়া যায় তখন তাহারা আমাদের ও আপনাদের দিকে তাকাইয়া রাজা ও প্রজা সকলের প্রতি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে।..”

“ বন্ধুগণ! শ্রবণ করো, তোমাদের তনু, মন ও ধন যদি গবাদি পশুর রক্ষার্থে নিয়োজিত না হয় তবে তাহার সার্থকতা কোথায়? পরমাত্মার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তিনি অখিল বিশ্ব ও সমগ্র পদার্থ পরোপকারের জন্য রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ তোমাদের তনু, মন ও ধন পরোপকারার্থে অর্পণ করো। ”

পরম উপকারী গবাদি পশুর হত্যাকারীদের বিবেকবর্জিত কর্মের তিরস্কার করে মহর্ষি লিখেছেন-

“ দেখুন, পশু অসার তৃণ, লতা, পাতা, ফল, ফুলাদি ভক্ষণ করে কিন্তু সার দুগ্ধাদি অমৃতরূপী রত্ন দান করে। লাঙ্গল চালাইয়া ও গাড়ী বহন করিয়া বহুবিধ খাদ্য পদার্থ উৎপন্ন করে এবং সে সকলের বুদ্ধি বল, পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়া আরোগ্য দান করে। সে পুত্র, কন্যা মিত্রগণের ন্যায় মানুষের সহিত বিশ্বাস ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করে। তাহাকে যেখানে বাঁধ সে সেখানেই বাঁধা থাকিবে যেদিকে চালাও সেদিকেই চলিবে, যেখানে হইতে সরাইবে সেখান হইতেই সরিয়া যাইবে, দেখিলে বা ডাকিলে নিকটে চলিয়া আসে। যখন সে ব্যাঘ্রাদি পশু বা ঘাতককে দেখে, আত্মরক্ষার জন্য সে নিজের প্রতিপালকের নিকট দৌড়াইয়া আসে, কেন না সে তাহার রক্ষা করিবে।

যাহার মৃত্যুর পর চর্মও কন্টকাদি হইতে রক্ষা করে, জঙ্গলে চরিয়া নিজের বৎস ও প্রভুকে দুগ্ধ দানের জন্য যথাস্থানে যথাসময়ে চলিয়া আসে, নিজের প্রভুর রক্ষার জন্য শরীর ও মন লাগাইয়া দেয়, যাহার যথা সর্বস্ব রাজা প্রজা সকল মনুষ্যের জন্যই অর্পিত, এইরূপ শুভগুণযুক্ত, সুখকারী পশুর গলায় ছুরি দিয়া যাহারা নিজের উদর পুরণ করে ও সংসারের ক্ষতি করে, সংসারে তাহাদের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসঘাতক, অপকারী, দুঃখদায়ী ও পাপী আর কে আছে?”

গবাদি পশু রক্ষার গুরুত্ব ও মহর্ষির মত

“ গবাদি পশু ও কৃষ্যাদি কর্মের রক্ষা ও বৃদ্ধির ফলে মনুষ্যাদি প্রাণী সর্ব প্রকারের সুখ লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া উক্ত সুখ মনুষ্য কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। ”

" দুগ্ধ ও অন্ন এক সঙ্গে যোগ করিয়া দেখিলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে (৪,১০,৪৪০) চার লক্ষ দশ হাজার চার শত চল্লিশ ব্যক্তির একবারের ভোজন ও পোষণ একটি গাভীর দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। এখন ছয়টি গাভীর বংশ পরম্পরার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের দ্বারা অসংখ্য মানুষের ভরণ পোষণ হইতে পারে। কিন্তু ইহার মাংস দ্বারা কেবল আশী জন মাংসাহারী একবার তৃপ্ত হইতে পারে। দেখিতে হইবে সামান্য লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বধ করিয়া অসংখ্য মনুষ্যের ক্ষতি করা মহাপাপ কিনা। "

" প্রমাণিত হইল যে গবাদি পশুর বিনাশ হইলে রাজা এবং প্রজার ও বিনাশ হয়। কারণ, পশুর সংখ্যা হ্রাস পাইলে দুগ্ধাদি পদার্থ এবং কৃষি কার্য্যাদিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দেখো এই জন্যই যে মূল্যে যে পরিমাণ দুগ্ধ ঘৃতাদি পদার্থ ও বৃষাদি পশু সাতশত বৎসর পূর্বে পাওয়া যাইত সেই পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃতাদি পদার্থ ও বৃষাদি পশু আজ কাল দশ গুণ মূল্যেও পাওয়া যায় না। কারণ গত ৭০০ সাত শত বৎসরের মধ্যে এই দেশে গবাদি পশুর হন্তা মাংসাহারী বিদেশী বহু সংখ্যায় আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা ঐ সব সর্বহিতকারী পশুর হাড় মাংস পর্যন্তও ছাড়ে না। "নষ্টে মূলে নৈব পত্রং ন পুষ্পম্" কারণের নাশ করিয়া দিলে কার্যের নাশ কেন হইবে না।"

" কোন ব্যক্তি যদি হরিণ ও সিংহাদি পশু এবং ময়ূরাদি পক্ষী হইতেও উপকার লইতে ইচ্ছা করে তবে সে লইতে পারে। কিন্তু সকলের পালন পোষণ উত্তরোত্তর সময়ানুকূল হওয়া চাই। অধুনা পরম উপকারী গবাদি পশুকে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।"

গোকরুণানিধিঃ -র ইংরেজি অনুবাদ করে ইংল্যান্ডে পাঠানোর উদ্যোগ-

" মহর্ষি গোরক্ষা আন্দোলনের সফলতার জন্য উক্ত পুস্তককে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে ইংল্যান্ডে রাজ্যাধিকারীদের কাছে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য লালা মূলরাজ এম০ এ০ নামক একজন ব্যক্তিকে ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব দেন। লালা মূলরাজ অনুবাদ করার কথাও দিয়েছিলো। কিন্তু একবছরের অধিক সময় (১৫ মাস) নিয়েও মহর্ষির বার বার পত্রব্যবহার সত্ত্বেও অনুবাদ করে দেয় নি ।

কারণ সে মহর্ষির দৃষ্টির আড়ালে মাংসভোজী ছিল । গোকরুণানিধিঃ পুস্তকে তার মাংসভক্ষণের প্রতিকূল মত থাকা কারণে এই বইটি অনুবাদ না করে বৃথা কালক্ষেপন করেছে। তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে; বোম্বাইয়ের কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা মহর্ষি গোকরুণানিধিঃর ইংরেজি

অনুবাদ করান। কিন্তু মহর্ষির দ্বারা করানো এই অনুবাদ সেসময় প্রকাশিত হয়েছিলো কি না সে-সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। ”

[- মহর্ষি দয়ানন্দ কে গ্রন্থো কা ইতিহাস । পৃষ্টা- ১৩৮। সংস্করণ- ১৯৪৯ সন্।]

অনুবাদ কার্যে দেরী হওয়া, মহর্ষির বিভিন্ন কাজে ব্যাস্ততা আর অকালে দেহ ত্যাগের কারণে মহর্ষির দ্বারা করানো ইংরেজি অনুবাদটির প্রকাশ করা বা ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়নি।

গোকরুণানিধিঃ পুস্তকের প্রচারকার্যে সাফল্য-

“ পণ্ডিত ভীমসেনের মহর্ষির নামে লিখিত পত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে 'গোকরুণানিধিঃ' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের সব কপি খুব দ্রুত বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এবং এক বছরের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মহর্ষির দ্বারা শুরু হওয়া গোরক্ষা আন্দোলনের কারণেই পুস্তকের বিক্রি এতো বেড়েছিলো। ”

[- মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী যুধিষ্ঠির জী মীমাংসক কৃত মহর্ষি দয়ানন্দ কে গ্রন্থো কা ইতিহাস । পৃষ্টা- ১৩৫ । সংস্করণ- ১৯৪৯ সন্।]

বেদপাঠের পূর্বে পালনীয় নিয়ম

বেদপাঠের সাধারণ নিয়ম

বেদ মন্ত্র পাঠকালীন কিছু সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম রয়েছে, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য বেদ পাঠকালীন পবিত্রতা বজায় রাখা। বেদবাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা ব্যতীত বেদপাঠ গুরুত্বহীন। কাজেই বেদ মন্ত্র পাঠ করার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে পবিত্রতা বজায় রেখে, যথাবিধি অনুসরণপূর্বক পাঠ করতে হবে।

’ওঙ্কারং বেদেষু।’

বেদ অধ্যয়নের আরম্ভে ওঙ্কার উচ্চারণ করবে।

’অথকারং ভাষ্যেষু।’

অথ শব্দ দ্বারা ভাষ্য বা ব্যাখ্যা আরম্ভ করবে।

’প্রয়তঃ।’

পবিত্র হয়ে বেদাধ্যয়ন করবে।

’শুচৌ।’

পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন করবে।

’ইষ্টম্।’

সুখদায়ক ভাবে বসে বেদাধ্যয়ন করবে।

’ঋতুং প্রাপ্য।’

উপযুক্ত ঋতুতে অর্থাৎ সময়ে বেদাধ্যয়ন করবে।

’যোজনান্ন পরম্।’

বেদাধ্যয়নকারী এক যোজনের বেশি পথ হেঁটে আসবে না। অর্থাৎ অধিক পরিশ্রমের পর বেদাধ্যয়ন করবে না।

’ভোজনং মধুরং স্নিগ্ধম্।’

মধুর ও স্নিগ্ধ ভোজন করে বেদাধ্যয়ন করবে।

[বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য ১।১৮–২৪]

ওঙ্কার উচ্চারণ বিধি

বেদমন্ত্র উচ্চারণের শুরুতে ও শেষে, প্রণব [ও৩ম্] উচ্চারণ করতে হয় [মনুস্মৃতি ২।৭৪]। ওঙ্কার সর্বদা প্লুতস্বরে উচ্চারণ করা উচিত [পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ৮।২।৮৭]।

হ্রস্বস্বর অ-কার উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে, দীর্ঘস্বর আ-কার উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময় লাগে এবং প্লুতস্বরে উচ্চারণ করতে সেই দীর্ঘস্বরের তিনগুণ সময় লাগে অর্থাৎ তিনটি "অ" বর্ণ ঠিক পর পর উচ্চারণ করার মতো বুঝবেন। 'ও' এবং 'ম্' এর মধ্যে যে সংখ্যাবাচক '৩' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়, সেটির দ্বারা প্লুতস্বর চিহ্ন বোঝানো হয়। এই প্লুতস্বরকে ত্রিমাত্র স্বর বলে।

অবগ্রহ [ঽ] উচ্চারণ বিধি

সংস্কৃতে লুপ্ত অ-কে 'অবগ্রহ' বলা হয়। এটি বাংলায় ঽ [অর্ধমাত্রা হ] দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই অবগ্রহ চিহ্ন ঽ যে সকল স্থানে আসবে সেখানে কোনোকিছুর উচ্চারণ হবে না। যথা— তপসোঽধ্যজায়ত, এখানে 'তপসো' এর পর অবগ্রহ চিহ্ন-ঽ এসেছে। এটি এখানে অনুচ্চারিত থাকবে।

অর্থাৎ তপসোঽধ্যজায়ত এর উচ্চারণ হবে তপসোধ্যজায়ত। মূলত সংস্কৃতে দুটি শব্দের সন্ধির কারণে অবগ্রহ চিহ্নের আবির্ভাব ঘটে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর কোনো ভূমিকা নেই। তাই এই অবগ্রহ চিহ্ন-ঽ যেখানে আসবে সেখানে তা নিঃশব্দ হিসেবে থাকবে, এর আলাদা কোনো উচ্চারণ হবে না।

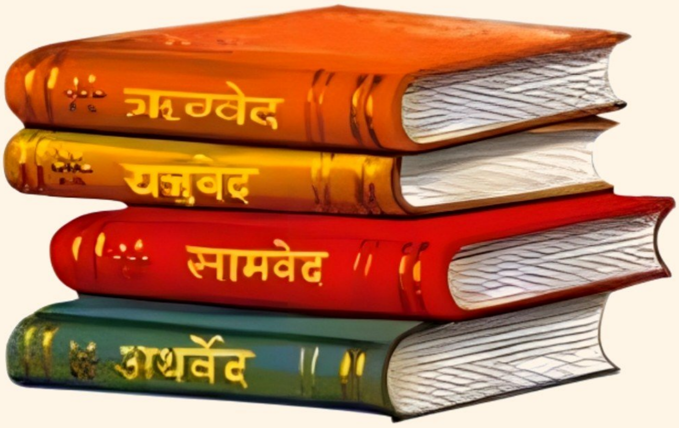

কেন আমি বেদকে ভালোবাসি ?

কারণ বেদ পরিষ্কার বলছে যে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ‘মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগত থাকা‘।

দেশ আক্রান্ত হলে মানুষ হিন্দু, মুসলিম অথবা খ্রিষ্টান যাই হোক না কেন সেই ব্যাপারগুলো পরে আসে।

কিছু কিছু মতবাদ (Cult) এই শিক্ষা দেয়-যদি স্বধর্মের শত্রু কোন দেশ নিজ মাতৃভূমিকে আক্রমণ করে তবে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা সেই সমস্ত মতবাদে বিশ্বাসী। ইন্ডিয়ার কমিউনিষ্টরা ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীনকে সমর্থণ করেছিল কারণ কার্ল মার্কস তাদের কাছে ভারতমাতা থেকে প্রিয় ছিল। আমরা খেলার মধ্যেও দেখি যে যোগ্যতার থেকে কে কোন মতবাদের তা নিয়ে দল সমর্থন করা হয় বা বিরোধ । বেদে এই ধরনের প্রতারণার কোন অবকাশ নেই। বাস্তবিকপক্ষে Motherland অথবা মাতৃভূমি অথবা ভারতমাতা অথবা মা তুঝে সালাম অথবা বন্দে মাতরম (যদিও সালামের ধারকগণ এই গানের লিরিক্সের সাথে একমত না) এর ধারণাগুলোর সূচনাই হচ্ছে অথর্ববেদের ভূমিসূক্ত [অথর্ববেদ ১২কাণ্ড ১ম সূক্ত]।

আরো পড়ুন বেদে দেশপ্রেম নিয়ে কী বলা হয়েছে -

https://www.agniveerbangla.org/2022/12/blog-post_15.html ,

বেদে বৈদিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও দেশাত্মবোধ নিয়ে কী বলা হয়েছে -

https://www.agniveerbangla.org/2022/12/blog-post_15.html

কারণ বেদ স্বধর্মত্যাগে মৃত্যুদণ্ড কিংবা অনন্তকাল নরকে জ্বলার ভয় দেখায় না

বৈদিক সংস্কৃতি তাকে অভিনন্দন জানায় যে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত মতবাদ অথবা তথাকথিত ঈশ্বর (God), ভগবান, অবতার, সাধক (Saint), উপাসনার সামাজিক নিয়মের উপর শ্রদ্ধাপূর্বক প্রশ্ন করে।

অন্যান্য পরবর্তী সময়ের প্রথার (Cult) অনুযায়ী নয় যেখানে স্বধর্মত্যাগ [পড়ুন স্বীয়মতবাদ] মানেই শক্তিস্বরুপ মৃত্যুদণ্ড। প্রাথমিক অবয়বটা বেশ সাধারণ এবং যুক্তিগত-যতক্ষণ না পর্যন্ত সমাজ তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে দেবে, রূঢ় অমানবিক নিয়মবহির্ভূত হয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কীভাবে উন্নতি, অগ্রগতি এবং নবধারা প্রবর্তিত হবে ? এই জন্যই আমরা দেখি যেসব সমাজে স্বধর্মত্যাগের পরিণামে শাস্তি ভোগ করতে হয় সেসব দেশ সেইসব নারকীয় পর্যায়ে পড়ে যারা সুসভ্যতার পর্যায়ে পৌছাতে গিয়ে প্রায় মুখ থুবরে হোঁচট খেয়ে পড়েছে।

সমস্ত ইউরোপ আইন বহির্ভূত অন্ধকার গণ্ডির মধ্যে পড়ে ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানকার মানুষ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। যে কোন কেউ এটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে আফ্রিকা, মিডেল-ইস্ট এমন কি আমাদের পাশের দেশের পশ্চিম বর্ডারের দেশের অবস্থা কেমন।

কারণ বেদই বিস্তৃত গভীর জ্ঞানের উৎস যা আজ মানবসমাজে পরিচিত (Because Vedas are the first source of wisdom known to humankind)

এখন পর্যন্ত কেউই বেদের বেদের উৎপত্তির যুক্তিগত সময় বের করতে পারে নি। সমস্ত প্রামাণিক বিচার বিশ্লেষন করে যখনই আমরা পিছনে তাকাই এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে সময়টায় অন্য মতবাদ ছিলো কিন্তু বেদের অস্তিত্ব ছিল না।

কারণ বেদ নিখুঁত ভাবে এমন এক ক্রমানুসারী পদ্ধতি (Systematic Manner) অবলম্বন করে সংরকণ করা হয়েছে যে সেই আদিকাল থেকে বেদ এখনও অপরিবর্তনীয় রয়েছে ।

শুধুমাত্র শব্দ সমূহই নয় এমনকি উচ্চারন এবং স্বরভেদসমূহ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় রয়েছে। বেদে ২০০০০ থেকেও বেশী মন্ত্র [২০৩৭৯] রয়েছে যা সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ চমৎকার কিছু মানুষের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের ফলস্বরুপের জন্য আজও অবিকৃত রয়েছে। A reason to congratulate 'being human' !

বিস্তারিত পড়ুন -

https://www.agniveerbangla.org/2019/01/blog-post_10.html

কারণ আমি যতটুকু পর্যন্ত অবহিত যে বেদই একমাত্র আধ্যাত্মিক গ্রন্থ যা সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত গল্প, মানবসমাজে অলৌকিকত্ত্ব, ইতিহাস এবং একক প্রতিষ্ঠাতা (Founder) বর্জিত যেগুলোর কাছে আমাদের অন্ধের মত নতি স্বীকার করতে হবে।

একটা দুর্লভ সুবিধা সত্যিকারের একটা প্রাগৈতিহাসিক গ্রন্থ হবার। (A rare advantage for being the truly pre-historic texts)।

কারণ বেদ সমন্বিত করা ঐশ্বরিক জ্ঞান। এটা শুধুমাত্র একটা বিস্তৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানই নয় একটা ব্যবহারিক জীবনের অন্তর্জ্ঞানলব্ধ পর্যাপ্ত জ্ঞানও বটে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাস্থ্য, সমাজ, পরিবার, অর্থনৈতিক, অর্থব্যবস্থাপনা বিদ্যা (Finance), গবেষণা, শিক্ষা এবং আরো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে।

আমি এমন কোন বিষয় খুঁজে পাইনি যার অনুপ্রেরণা বেদে বর্ণিত নেই।

কারণ বেদ কাউকে মাত্রাতিরিক্ত সাহায্য করে না।(Because Vedas do not spoon-feed.)

বিকল্প হিসেবে বেদ গবেষণা এবং জ্ঞানার্জনের (Research and Exploration) উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে উৎসাহ করে। বেদ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে এবং চায় মানুষ যেন স্বপ্রচেষ্টায় সেগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

কর্মফল বিষয়ে পড়ুন -

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/07/blog-post.html

কারণ বেদ কোন কিছু অন্ধের মতন বিশ্বাস করতে বলে না।

বেদই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যাতে ঈশ্বর বা ধর্মতত্ত্বের [যা পক্ষপাত রহিত, ন্যায়াচরণ-সত্যভাষণাদি যুক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা বেদের অবিরুদ্ধ তাকে 'ধর্ম' এবং যা পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ, মিথ্যাভাষণাদি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন বেদবিরুদ্ধ তা 'অধর্ম] প্রতি তীব্র কটাক্ষকারীকে কোন প্রকার অমানবিক শাস্তি প্রদানের বিধি নেই। সর্বোপরি বেদ এটাই দাবী করে সমস্তকিছু যেন আন্তরিকভাবে জনার চেষ্টা করা হয় এবং সত্যকে এক এক জনের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোত্তমভাবে উপলব্ধিকরে তা যেন গ্রহণ করা হয়। এমনকি কেউ যদি মনে করে যে বেদ ভুল তবে সে তা পরিত্যাগ করতে পারে বেদ তাতে বাধা দেবে না কারণ সে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বেদ সঠিকভাবে অধ্যয়ন করেছে।

বেদ অন্যান্য মতবাদের গ্রন্থের মতন নয় তাই যে বেদ ত্যাগ করবে তার জন্য কোন প্রকার শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড, কোন ধরনের ঐশ্বরীক ক্রোধ, আংশিক অথবা পূর্ণরুপে বেদ ত্যাগকারীকে কোন প্রকার হুমকির কেন ধরনের বিধান নেই। যে বেদ মানে না ও বেদ বিরুদ্ধ আচরণ করে তাঁর কর্মফল সে পাবে। সমাজে নিরুপদ্রব হলে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে বেদ মাথা ঘামায় না বরং কর্মফল ও পুনর্জন্মের মাধ্যমে পুনরায় চেষ্টাব করার সুযোগ প্রদান করে । বেদ এমন না যে আপনি কেবল মাত্র বেদে বিশ্বাস না করার কারণে সমস্ত পুণ্যকাজ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং আপনার জন্য অনন্তকালের নরকবাস ফিক্সড।

কারণ বেদ এই ত্রিমাত্রিক জগতে ত্রিমাত্রিক বিষয়কে কোন ধরনের অদেখা অথবা অযাচাইযোগ্য জিনিসের উপর অন্ধের মতন বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে না।

বেদ সমস্তপ্রকার যুক্তির উপর ভিত্তি করা যা আমাদের প্রত্যেকের বিচক্ষণতার সাথে আমাদের মনে সুপ্ত রয়েছে। নিয়মিত চর্চা এবং স্ব-ইচ্ছার দ্বারা একজন মানুষ তার এই জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। যেমন ঈশ্বর ইন্দ্রিয়লব্ধ নন । কিন্তু বেদ আপনাকে সেই পথ দেখাবে যাতে আপনি ঈশ্বরানুভব করতে পারেন।

এখানে সেই সুযোগ আছে

https://www.agniveerbangla.org/2022/06/blog-post_27.html।

এমনকি যদি আপনি তাতে ব্যর্থও হন তারপরেও আপনি বৈদিক জীবনধারায় যে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ জীবন পাবেন তা অন্য কোন মতবাদে পাওয়া সম্ভব না । তাই কোনকিছুতে অন্ধের মতন বিশ্বাস করার পরিবর্তে, প্রত্যেকের উচিৎ নিজ চেষ্টায় ও গভীরভাবে চিন্তার দ্বারা সেই সাথে সুকর্ম এবং জ্ঞান অন্বেষণের দ্বারা সত্য এবং বিস্তৃত জ্ঞান জানা। 'পরীক্ষা' — পরীক্ষা পাঁচ প্রকার। প্রথমতঃ – ঈশ্বর ও তাঁর গুণ-কর্ম-স্বভাব এবং 'বেদবিদ্যা' ; দ্বিতীয়তঃ – প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয়তঃ – সৃষ্টিক্রম; চতুর্থঃ - আপ্তদের ব্যবহার এবং পঞ্চমতঃ – নিজ আত্মার পবিত্রতা এবং বিদ্যা। এই পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করে সত্যগ্রহণ ও অসত্য বর্জন করা কর্তব্য।

কারন বেদ প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন।

বেদ এমন এক যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত যখন ছিলনা কোন মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদী, সাম্যবাদী ব্লা ব্লা ব্লা। একমাত্র বেদ ও বেদ প্রতিপাদিত বৈদিক ধর্মই পারে সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তি হতে এবং

সেই সাথে পরবর্তী যুগের মনুষ্য কর্তৃক সৃষ্ট ধর্ম নামক মতবাদের বিভাজন ধ্বংস করে মানুষের মধ্যে একতা গঠন করতে পারে - https://www.agniveerbangla.org/2018/02/blog-post_81.html

কারণ বেদে কোন প্রকার কুসংস্কারের কোন অবকাশ নেই।

বেদ বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উৎসাহ প্রদান করে এবং সেই সাথে সমস্ত দাবী (Claim) পরিত্যাগ করতে বলে যা নিছকই কোন যৌক্তিক কারণ ব্যতিত অজস্র কল্পনাপ্রসূত দাবীর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

কারণ বেদে অবিশ্বাসীদের জন্য কোন ধারণা নেই (Because Vedas have no concept of disbelievers.)

বেদ কোন মানুষ,বা কোন বই অথবা কোন ধারণাকে (Concept) এই কারণ বিশ্বাস করতে বলে না কারন অনেক মানুষ সেটা অনুসরণ করে। এর পরিবর্তে বেদ আমাদের উচ্চ প্রশংসা করে সেইসব জিনিসের পক্ষে সাহসী যোদ্ধার মতন উঠে দাঁড়াতে যা আমাদের স্বতন্ত্র অভিপ্রায় (Egoless intentions) এবং হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা সত্য বলে উপলব্ধি হয়। ধর্ম কোন গণতান্ত্রিক বিষয় নইয় । যা সত্য তা ১জন মানলেও সত্য , যা মিথ্যা তা ৭০০ কোটি মানুষ মানলেও মিথ্যাই ।

আস্তিক্যবুদ্ধি সম্পর্কে এই নিবন্ধটি পড়ুন -

https://www.agniveerbangla.org/2022/04/blog-post_24.html

কারণ বেদ জাতি(Gender) - জন্ম - বর্ণ - এলাকা - মতবাদ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সমান সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত অধিকার দাবী করে ।

বৈদিক সাম্যবাদ -

https://www.agniveerbangla.org/2022/04/blog-post_25.html

কারণ বেদ দাবী করে যে মেধাই একমাত্র পার্থক্যের কারণ হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন অধিকার রক্ষায় সর্বদা সংবেদনশীল হবে। (And be sensitive to protection of rights of differently-abled.)

বৈদিক বর্ণব্যবস্থা -

https://www.agniveerbangla.org/2021/07/blog-post_20.html

কারণ বেদ পৃথিবীতে নারীদেরকে সন্তানে সদ্‌গুণের উৎস হিসেবে মানে (Because Vedas consider women as source of goodness on earth.)

বেদ আমাদের শিক্ষা দেয় সমস্ত মেয়েদের মধ্যে একজন মা কে দর্শন করতে এবং তাদের সম্মান করতে। মেয়েরা কোন জড়বস্তু তথা কোন খেলনা নয় অথবা নয় কোন ফুর্তি করার বস্তু, কিংবা কোন কাল্পনিক প্রথম পুরুষের অঙ্গ থেকে আসা কোন প্রাণী নয় যেরকমটা অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে।

কারণ বেদ আমাদের কখনো কাল্পনিক চিরন্তন সুখের স্থান, ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত দূত যিনি গ্রন্থ আপডেট করেন কিংবা কোন অপ্রাকৃত সত্ত্বা যা আমাদের ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায় তা বিশ্বাস করতে বলে না।

বেদে 'স্বর্গ' –সুখ বিশেষ ভোগ এবং তার সাধন প্রাপ্তির নাম 'স্বর্গ'। ইহলোকে সুখ সামান্য স্বর্গ ও মুক্তি বা মোক্ষকে বিশেষ স্বর্গ বলে ।

'নরক' –দুঃখ বিশেষ ভোগ ও দুঃখের সাধন প্রাপ্তির নাম 'নরক'। ইহজগতে কর্মফল ও ত্রিবিধ দুঃখ এবং জন্মান্তরে মনুষ্যেতর যোনি নরক ।

'জন্ম' – আত্মার শরীর ধারণপূর্বক প্রকট হওয়ার নাম জন্ম। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভেদে জন্ম ত্রিবিধ ।

'জন্ম ও মৃত্যু' –শরীরের সাথে জীবাত্মার সংযোগ হওয়াকে 'জন্ম' এবং বিয়োগ হওয়াকে 'মৃত্যু' বলে।

কারণ বেদ আমাদেরকে অন্যের প্রতি সহনশীল হতে বলে, যেমন করে আমরা আমাদের নিজেদের দুর্বলতাকে সহ্যকরে থাকি।

যদিও আমরা দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর আলাদা আলাদা, তথাপি বেদ আমাদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে এবং সংঘবদ্ধ হতে প্রেরণা প্রদান করে। বেদ বলে যে, এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা, প্রথা,সামাজিক নিয়ম, ভাবাদর্শ এবং সংস্কৃতি বিদ্যমান কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র জীবজগতের মধ্যে বিদ্যমান শুভশক্তির ভিত্তিতে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।

অনেক ধর্মমত সত্যের উপর একাধিপত্যতা ঘোষণা করে এবং যে সকল ব্যক্তি এই দাবি করা সত্যকে প্রত্যাখান করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকে। বেদ অনুযায়ী এগুলো নিছক কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয়। কারন কোন নিয়মই তোমাকে ঐ নিয়ম অনুসরন করার জন্য জোর প্রয়োগ করবে না।

$E=mc^2$ আপেক্ষিকতার সূত্র। কিন্তু আইনস্টাইনের গবেষণা কখনোই এটা বলেনা যে, যদি তুমি এই নিয়ম না মানো তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। যে কোন নিয়মই নিরপেক্ষ ভাবে সত্য ধারন করবে। যেখানে একজন সেটা বিশ্বাস করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। তাই অন্ধের মতন $E=mc^2$ মান্য করার পরিবর্তে বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরা তাদের যোগ্য শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে,যাতে তারা নিজেরা বুঝতে পারে এবং ঐ নিয়ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে অথবা তারা ঐ নিয়মের উন্নতি সাধন করতে পারে, এবং যদি অধিকতর বিজ্ঞ কেউ থেকে থাকে তবে সে আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন মতবাদের দ্বারা এটাকে প্রত্যাখানও করতে পারে। এটিই বৈদিক পন্থা ॥

কারণ, বেদের ঈশ্বর আকাশের উপরে কোন আসনে অধিষ্ঠিত থাকে না।(Because god of Vedas does not sit on a chair on the top of the sky).

যেহেতু বেদের বর্ণনায় পৃথিবী গোলাকার; চতুর্থ আকাশ বা সপ্তম আকাশ বা আকাশের শীর্ষ এই ধারণাগুলো বেদ অনুযায়ী সম্পূর্ণই অবান্তর ধারণা। বেদের ঈশ্বর দ্বারা এমন একটি উৎসকে বোঝান হয় যা সমগ্র জীব জগতকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকে এবং এটা নিশ্চিত করে যে, সমগ্র জীবজগত কিছু অপরিবর্তনশীল নিয়মের দ্বারা জড় জগতের সাথে আন্ত ক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে [যাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; যিনি সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত; যাঁর গুণ, কর্ম ও স্বভাব পবিত্র; যিনি সর্বজ্ঞ, নিরাকার, সর্বব্যাপক, জন্মরহিত, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ন্যায়কারী, সকল সৃষ্টির কর্তা-ধর্তা-হর্তা; সত্য ও ন্যায়ানুসারে সর্বজীবের কর্মফলদাতা -ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত তিনিই পরমেশ্বর - https://www.agniveerbangla.org/2022/11/blog-post_16.html]।

বেদের ঈশ্বর কখনো তার নিয়মে গোলযোগ সৃষ্টি করেনা অথবা কোন অলৌকিকতা প্রদর্শন করেনা বা কখনো রাগ করে না, বা ঘুমায় না, বা দূতের কোন দরবার বা সৈন্যবাহিনী রাখেনা অথবা কারো জন্য পক্ষপাত করেনা । বেদের ঈশ্বর সদা আমাদের ভিতরে এবং বাইরে এবং সর্বত্র বিদ্যমান, অপরিবর্তনশীল, জন্মরহিত,মৃত্যুরহিত, ব্যক্তিসত্তাহীন এবং অবিচলিত নিয়ম প্রতিপালক । যদিও বেদের ঈশ্বর বা পরমাত্মা পরবর্তী যুগের ধর্মীয় পুস্তকাদির ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সত্ত্বা। শব্দের একই ব্যাবহার অনেক জটিলতা সৃষ্টির কারণ ।

কারণ, বেদের বর্ণনায় পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে।

এটা মধ্যযুগীয় কোন গ্রন্থের মতন নয়। বেদে পৃথিবী সমতল নয়। বেদের তত্ত্বে দুই চৌম্বক মেরুর মধ্যবর্তী ধাতব পদার্থের গতিশীলতার কারণে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

বেদে তত্ত্ব মধ্যাকর্ষণ ও বৈদ্যুতিক বল বিপরীত বর্গীয় সূত্রই প্রতিপাদন করে যা বিজ্ঞানীগণ স্বীয় মেধাবলে আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। বেদে গ্রহসমূহের কক্ষপথ আছে। বেদানুযায়ী বাইনারি লজিক স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক হিসাব নির্দেশ করতে পারে। বৈদিক গ্রন্থ ছাড়া অন্যকোন ধর্মীয় গ্রন্থ এতটা বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। এখনো কিছু কিছু গোড়া ধর্মমত এসকল বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের বিশ্বাসকারীদেরকে ব্লাসফেমী হিসেবে শাস্তি দিয়ে থাকে।

পড়ুন "বৈদিক বিজ্ঞান' -

https://drive.google.com/file/d/1hb1t
-iO6GYEd72urYcXPdHqUtVxD46hO/view?usp=sharing

কারণ, বেদকে বা কোন বৈদিক নিয়মকে অবজ্ঞা করলে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়না।

ধরুন একজন ধার্মিক মা যিনি একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করেন। একদিন তার ছেলেকে সাপে কেটেছে। সে তার ছেলের জীবন বাঁচানোর এক ঝাড় ফুঁকওয়ালার কাছে ছুটে গেল। এখন আপনি কি তাকে ভুল বলবেন নাকি সঠিক বলবেন?

আজকাল ঈশ্বরের উপাসনা যাই হোক না কেন সবাই আসলে একই অবস্থায় আছে। তাদের উদ্দেশ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা অটল; কিন্তু সেই শ্রদ্ধা বা ভক্তি কখনো অন্ধবিশ্বাস ও কখনো এমন উগ্রতায় পরিণত যে মানবজাতির প্রতি হুমকিস্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন তারা ঈশ্বরের উপাসনার ভুল পথকে গ্রহণ করেছে। একটা বিষয় নিশ্চিত যে সকল সনাতনীরা যারা বেদ সম্পর্কে সামান্য কিছুটা জ্ঞান রাখে তারা মানতে বাধ্য যে বেদই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ। তাই ইতিহাসের কালজয়ী এ সকল মহৎ পুণ্যবানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঠিক পন্থা হচ্ছে তাদের সকল গুণ গুলো আত্মস্থ করা এবং তাদের ন্যায় মহৎ কর্ম করা। উদাহরণ স্বরূপ, রাবণকে আমরা দেখতে পাই একজন স্বেচ্ছাচারী, পাপাচারী, ধ্বংসকারী, অন্যায়কারী এক রাজা হিসেবে। যদি আমরা এক হয়ে বর্তমানের সকল রাবণের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেটাই হবে শ্রী রাম চন্দ্রের যথার্থ মহিমা প্রকাশ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ঠিক একই ভাবে শ্রী কৃষ্ণ, হনুমান ইত্যাদি। আমরা এই ভাবে ঐ সকল পুণ্যাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি এবং আমরা সকল সম্প্রদায়ের ভক্তদের প্রতি আন্তরিক ভাবে প্রণাম জানিয়ে তাদের নিকট প্রার্থনা করবো যেন সকল ভক্তরা সে ভাবেই ঈশ্বর উপাসনা করবেন যেভাবে শ্রী রাম চন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণ করেছিলেন তাঁদের জীবদ্দশায় - https://www.agniveerbangla.org/2019/04/blog-post.html।

কারণ, সকল সম্প্রদায়েরই তাদের নিজস্ব বিশ্বাসগুলোকে কাউকে ভীতিপ্রদর্শন না করে প্রচার করার স্বাধীনতা আছে।

পড়ুন - " বিশ্ব পরিবার বৈদিক ধর্ম - বিচ্ছিন্ন নয় সংযুক্ত করে" বৈদিক সনাতন ধর্মই কেন মানব ধর্ম এবং ব্যক্তিগত- পারিবারিক - সামাজিক - রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কিভাবে একমাত্রই বেদই আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে বেদ মন্ত্র দ্বারা ব্যাখ্যাসহ প্রতিপাদন করা হয়েছে ।

লিংক -

https://drive.google.com/file/d/1CHL_qx8MbJZIO74dOTHPdlWckOb8UIIF/view?usp=sharing

কারণ বেদ আমাদের সেই সকল মতান্ধদেরকে নির্মূল করতে বলে, যারা তাদের অন্ধবিশ্বাসগুলো অমান্যকারীদের ঘৃণা করতে বলে।

যে সকল ব্যক্তি মনে করে যে, যে কোন উপায়ে নাস্তিকদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া উচিত, ঐ সকল ব্যক্তি মানবতার চরম শত্রু। সমাজের এসব উপাদান সমাজ থেকে পরিষ্কার করা উচিত যাতে করে সমাজে মানবিকতা।

কারণ, বেদ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলে। এক নর - এক নারী, এটিই বৈদিক পন্থা।

বহুবিবাহ একয়ামত্র পুরুষের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার, বেদ অনুযায়ী এই ধারণা একটা অসুস্থ বিশ্বাস মাত্র। এটা বড়জোর একটা সামাজিক অন্যায় যেটাকে সমূলে উৎপীড়ন করা বাঞ্চনীয়। পবিত্র ঋগ্বেদ এর দুটি মন্ত্র যথাক্রমে ৪.৩.২ ও ১০.৭১.৪ এ বলা হয়েছে "যায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ অর্থাৎ যেভাবে জ্ঞানীগন জ্ঞানপ্রাপ্ত হন ঠিক সেভাবে একক পতি-পত্নীযুক্ত সংসার আনন্দ ও সুখ লাভ করেন। অথর্ববেদ ৭.৩৮.৪ হলো বিবাহ প্রতিজ্ঞা সূক্ত।এই পুরো সূক্তেই বর্ণনা করা হয়েছে বিয়ের সময় কী কী প্রতিজ্ঞা যজ্ঞে করতে হয়। বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীর প্রতিজ্ঞা হিসেবে মন্ত্রে বলছে- অহং বদামি নৈত্ত্বং সভায়ামহ ত্বং বদ। মমদেসস্ত্বং কেবলো নান্যাসদং কীর্তায়াশ্চন।। অর্থাৎ এই সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করছি তুমি শুধু আমার হবে,অন্য দ্বিতীয় কারো কথা বলা তো দূরে থাক চিন্তাও করবেনা। অর্থাৎ বিয়ের সময় প্রতিজ্ঞাই করতে হবে এক বিবাহের,এক বন্ধনের। তাহলে বুঝতেই পারছেন পবিত্র বেদে বহুবিবাহ একদম নিষিদ্ধ। অথর্ববেদ ৩.১৮.২ বলেছে সপত্নীং মে পরা ণুদ পতিং মে কেবলং কৃধি। অর্থাৎ পতি ও পত্নী যেন একে অপরের জন্য কেবল ১ জন থাকে,একে অপরকেই শুধু ভালোবাসে।

কারণ, বেদ তিনবার একটা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের বিরোধী ।

বেদানুযায়ী পুরুষ এবং নারীর মধ্যে বৈবাহিক অধিকারে কোন পার্থক্য নাই - https://www.agniveerbangla.org/2018/08/equality.html।

স্বামী তার স্ত্রীকে কখনো আঘাত করতে পারবে না। কেউ উপপত্নী অথবা দাসী রাখতে পারবে না। বেদ অনুযায়ী বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ - https://www.agniveerbangla.org/2023/04/blog-post_26.html। বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়।

কারণ, বেদে নারীরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, ব্যাবসায়ী, যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, রাজ্যপ্রধান, পূজারী, শিক্ষিকা, চালক যে কোন স্বাধীন পেশাজীবী হতে পারবে।

নারীদের পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রদত্ত কোনবাঁধা নেই।

পড়ুন - বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা - https://www.agniveerbangla.org/2023/06/blog-post.html,

বেদে প্রযুক্ত নারীবাচক শব্দ ও তার তাৎপর্য - https://www.agniveerbangla.org/2023/04/blog-post_10.html ,

বেদে শিক্ষিত নারীর জয়গান - https://www.agniveerbangla.org/2023/06/blog-post_13.html

কারণ, বেদে নারীদেরকে পর্দার মধ্যে থেকে এবং গৃহবন্দী থেকে ভিটামিন "ডি " এর অভাবে শরীর ধ্বংস করতে বলা হয় না।

নারীরা তাদের স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য এবং স্বস্তি বিপন্ন না করে অথবা কোন ধর্মীয় প্রতিনিধির অনুমোদন ছাড়াই যে কোন সুন্দর শালীনতা সম্পন্ন পোষাক পরিধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন। পড়ুন- নারীর পোশাক নিয়ে শ্রীরাম [https://www.agniveerbangla.org/2019/04/blog-post_11.html]

আরো এমন প্রচুর কারণ রয়েছে বেদকে ভালোবাসার জন্য । আসুন বেদকে ভালোবাসি, বেদের বিধানে জীবন গড়ি ।

সামবেদ কি ঋগ্বেদেরই অংশ বা সংকলন ?

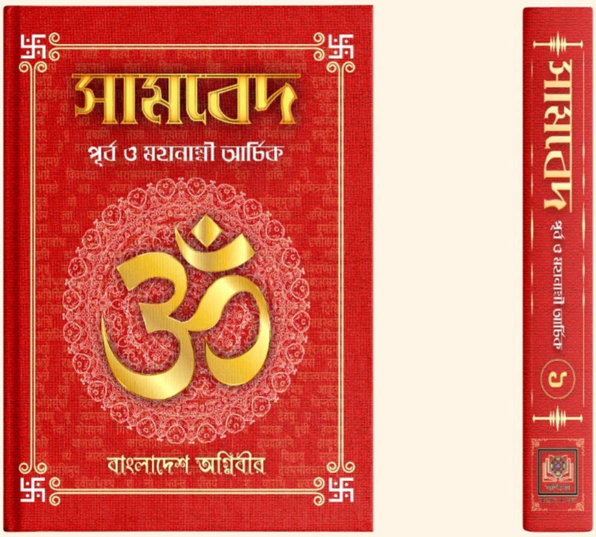

কিছু ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের ধারণা হলো সামবেদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা বা মৌলিকত্ব নেই, বরং এটি গানের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত ঋকের সংকলনমাত্র। এটি মূলত তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ-

(১) সামবেদ যদি শুধু গানের জন্যই ঋগ্বেদ থেকে সংকলন করা হত, তবে এতে কেবল সামগানের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলোই থাকত। অথচ সামবেদে এমনটি দেখা যায় না। সামবেদে ৪৫০টি এমন মন্ত্র আছে, যেগুলোর উপর সামগান আরোপিত হয় না। শুধু গানের জন্য সামবেদ সংকলিত হলে সামবেদে এমন মন্ত্রের সংগ্রহ থাকত না।

(২) সামবেদে প্রাপ্ত অধিকাংশ ঋগ্বেদীয় ঋকগুলোর মধ্যে আংশিক সাম্যতা আছে। কিছু ঋকে পাঠভেদ আছে, কিছু কিছু ঋকে পাদ-ব্যত্যয় আছে, কিছু ঋক আবার অপূর্ণ। যদি ঋগ্বেদ থেকে এই ঋকসমূহ নেয়া হত তাহলে এতে পাঠভেদ থাকত না এবং ঋকসমূহ আংশিক ভাবে না নিয়ে পূর্ণরূপেই নেয়া হত। যেমন- ঋগ্বেদে 'অপো মহি ব্যয়তি' (ঋ০ ৭।৮১।১) পাঠ আছে, কিন্তু সামবেদে 'অপো মহী বৃণুতে' (সাম০ ৩০৩) পাঠ রয়েছে। ঋগ্বেদে 'অরং বহন্তি মন্যবে' (ঋ০ ৬।১৬।৪৩) এবং সামবেদে 'অরং বহন্ত্যাশবঃ' (সাম০ ২৫) পাঠ রয়েছে। একই ভাবে শব্দের বানানেও ঋগ্বেদে ও সামবেদে পার্থক্য আছে।

যেমন– ঋগ্বেদে "ইদং বিষ্ণুঃ...পাংসুরে" (ঋ০ ১।২২।১৭) মন্ত্রে 'পাংসুরে' পাঠ থাকলেও সামবেদে 'পাংসুলে' (সাম০ ১৬৬৯) পাঠ আছে। আবার ঋগ্বেদের "পরি ত্যং হর্যতং হরিম্" (ঋ০ ৯।৯৮।৭) মন্ত্রের শুধু একটি পাদই সামবেদে "পরি ত্যং হর্যতং হরিম্" (সাম০ ১৬৮১) রূপে রয়েছে, শেষ তিনটি পাদ এখানে নেই। এগুলো আংশিক সাম্য। এরকম উদাহরণ অনেক রয়েছে। আমাদের সামবেদ ভাষ্যের টিপ্পনীতে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পাঠভেদ বা শব্দভেদগুলো কোনো বিকৃতি বা কোন অপপাঠ নয়, বরং সামবেদেরই স্বতন্ত্র সত্তা, মৌলিকত্ব ও গভীর তাৎপর্য নির্দেশ করে।

(৩) সামবেদের মন্ত্রগুলো যদি ঋগ্বেদ থেকে সংকলন করা হত তবে সামবেদের এই মন্ত্রগুলোর ঋষি ও দেবতাও ঋগ্বেদের ঋষি ও দেবতার সাথে অভিন্ন হত। কিন্তু সামবেদের অনেক মন্ত্রের ঋষি ও দেবতার সাথে ঋগ্বেদের ঋষি ও দেবতার ভিন্নতা দেখা যায়। এই ভিন্নতাগুলো আমাদের বেদভাষ্যের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

(৪) যদি সামবেদের মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকেই নেয়া হত তাহলে সামবেদের মন্ত্রগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে সার্বিক দিক দিয়ে বা অংশত ঋগ্বেদের ক্রমকেই অনুসার করা হত। কিন্তু সামে এমনটি হয়নি।

(৫) ঋগ্বেদ ও সামবেদের স্বরাঙ্কন পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। ঋগ্বেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের জন্য পৃথক চিহ্ন রয়েছে। অপর দিকে, 'নারদীয় শিক্ষা' অনুসারে সামবেদে ১, ২, ৩ অংকগুলো দ্বারা যথাক্রমে মধ্যম (ম), গান্ধার (গ) ও ঋষভ (রে) স্বর বোঝানো হয়। এছাড়াও ঋগ্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রের উচ্চারণেও পূর্ণ ভিন্নতা আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রুতগতিতে পাঠ করা হয়, অথচ সামবেদের মন্ত্র ধীরগতিতে পাঠ করা হয়।

(৬) ঋগ্বেদে স্বয়ং সামবেদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত শব্দ ৩৭ বার এসেছে। যেমন– 'সাম' শব্দটি ১৩ বার, 'সামান্যঃ সামভিঃ' ও 'সামানি' শব্দগুলো ৪ বার, 'সামন্' শব্দটি ৩ বার, 'সাম্নে' শব্দটি ২ বার এবং 'সামগা ইব', 'সামগাম্', 'সাম্নাম্', 'সামনৌ', 'সাম্নঃ', 'সাম্না' প্রভৃতি শব্দগুলো ১ বার করে ঋগ্বেদে উল্লেখিত হয়েছে। এই 'সাম' (ঋ০ ১।৬২।২, ২।৪৩।২), 'সামগাঃ' (ঋ০ ২।৪৩।১২), 'সামভিঃ' (ঋ০ ১।১০৭।২), 'সামানি' (ঋ০ ৫।৪৪।১৪, ১৫), 'সাম্নঃ' (ঋ০ ২।২৩।১৬), 'সাম্না' (ঋ০ ৮।৯৫।৭), 'সাম্নে' (ঋ০ ৮।৪।১৭) শব্দগুলো ঋগ্বেদের এসব সন্দর্ভে উল্লেখ থাকায় এটি সিদ্ধ হয় যে সামবেদ ঋগ্বেদ থেকে অর্বাচীন ও ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত নয় বরং সামবেদ একটি মৌলিক বেদ।

(৭) ঋগ্বেদের "ঋচাং ত্বঃ" (ঋ০ ১০।৭১।১১) মন্ত্রে শক্করী ছন্দে গানের বর্ণনা আছে, যা মূলত সামবেদের ঋত্বিক 'উদগাথা' এর কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে। এছাড়া বৃহৎ সাম, রথন্তর সাম ইত্যাদির উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। ফলে ঋগ্বেদের মাধ্যমে সামবেদের মৌলিক সত্তা জ্ঞাত হওয়া যায়।

(৮) স্বয়ং ঋগ্বেদে "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ....ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" (ঋ০ ১০।৯০।৯) মন্ত্রে পরমাত্মা হতে একসাথে ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব–এই চার বেদের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে স্বতঃপ্রমাণ বেদ বচনের মাধ্যমেই সামবেদের মৌলিকত্ব ও পৃথকত্ব প্রমাণ হয়।

(৯) মধ্যকালীন সায়ণ, উব্বট প্রমুখ বেদভাষ্যকারগণসামবেদের স্বতন্ত্র সত্তা মানতেন। যেমন–সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের পর সামবেদের উপর ভাষ্য লিখেছিলেন।

(১০) যে ৭৫টি মন্ত্রকে বিপক্ষগণ সামবেদের মৌলিক মন্ত্র দাবি করেন, সেগুলোই যদি শুধুমাত্র সামবেদের মৌলিক মন্ত্র হত তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা পুঁথিতে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই এগুলোকে সামবেদের মৌলিক মন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা থাকত। অথবা শুধুমাত্র এই ৭৫টি মন্ত্রের সমন্বয়ে সামবেদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত। কিন্তু তা পাওয়া না যাওয়ায় সিদ্ধ হয় শুধু এই ৭৫টি নয়, বরং সামবেদের পুরো ১৮৭৫টি মন্ত্রই মৌলিক মন্ত্র। এজন্য রাণায়নী বা কৌথুমীয় কোনো শাখাতেই এই মন্ত্র সংখ্যার কোনো ভেদ নেই।

(১১) সামবেদের মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে মৌলিক পার্থক্য আছে। দুইয়ের বিভাজন পদ্ধতি আলাদা। ঋগ্বেদ মণ্ডল, সূক্ত ও ঋকে বিভক্ত। অপরদিক্রে সামবেদে কাণ্ড, অধ্যায়, দশাতি ইত্যাদিতে বিভক্ত। দুইয়ের বিষয়বস্তু আলাদা। দুইয়ের কার্য আলাদা। ঋগ্বেদ পরমাত্মা স্তুতি, জাগতিক ও পারমার্থিক জ্ঞান ও সামবেদ সেই পরমাত্মারই সঙ্গীতময় উপাসনা তথা মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশক।

উক্ত বিবরণ হতে জানা যায়, সামবেদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এটি ঋগ্বেদের উপর আশ্রিত নয়, বরং স্বতন্ত্র।

বেদে "হরি" মাহাত্ম্য

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। বেদে সর্বত্র এই পরম সত্যটি পুনঃপুনঃ কথিত হয়েছে। "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" ঋগ্বেদ ১০।১১৪।৫ =এক ঈশ্বরকেই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়, "য় এক ইত্তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ। পতির্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ॥" ঋগ্বেদ ৬।৪৫।১৬ = তোমাদের ঈশ্বরের স্তুতি ও প্রার্থনা করা উচিত, যিনি একাই সর্বজ্ঞ এবং সুষ্ঠুভাবে জানেন সকল জীবের কার্যক্রম। তিনিই এই মহাবিশ্বের কর্তা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই আমাদের নানা ধরনের ধনসম্পদ দান করেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে [৬।২।১-২] দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর একজনই এবং দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" = [ঈশ্বর] কেবল এক এবং অদ্বিতীয় ।

পরমাত্মার অসংখ্য নাম রয়েছে । মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী 'সত্যার্থ প্রকাশ' ১ম সমুল্লাসে পরমাত্মার ১০০ নাম ব্যাখ্যা করার পর বলেছেন '... পরমেশ্বরের অসংখ্য নাম রয়েছে । কারণ পরমেশ্বরের গুণ - কর্ম - স্বভাব যেমন অনন্ত তেমনই তাঁর নামও অনন্ত.. আমার এই নামগুলো সমুদ্রে বিন্দুর ন্যায় '।

অর্থাৎ বেদে পরমাত্মার আরো অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে । বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপেও আমরা সেসকল শব্দ পেয়ে থাকি । মহর্ষি মঙ্গলাচরণে 'অথ' ও 'ওম্' প্রয়োগ করতে বলেছেন 'হরি ওম্' ব্যতীত তা দেখে অনেকে ভাবেন বেদে সম্ভবতঃ হরি পরমেশ্বরবাচক হিসেবে নেই। কিন্তু তা ঠিক নয় কেননা মহর্ষি এখানে আর্ষ পরম্পরার মঙ্গলাচারণ নিয়েই কথা বলছেন, পরমাত্মার নাম কিনা সেটি তা নিয়ে নয় ।

বেদে বহুস্থলে পরমাত্মার জন্য 'হরি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । আমরা আজ সরলার্থসহ সেই সুধা আস্বাদন করবো -

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সয়ুগ্বভিঃ সূরো ন সয়ুগ্বভিঃ।
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
বিশ্বা যদ্রূপা পরিয়াস্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভিরৃক্বভিঃ ॥
সামবেদ ৪৬৩

সরলার্থঃ এই সোম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে কর্মে প্রেরণকারী আত্মা এই হৃদয়হারিণী তেজস্বিতা দ্বারা পবিত্রতা দিয়ে সঙ্গী প্রাণের সাথে মিলে সমস্ত দ্বেষকারী বিঘ্ন অথবা কাম, ক্রোধ আদি ছয়টি রিপু অতিক্রম করে নেয়, যেভাবে সূর্য সহযোগী কিরণ দ্বারা সমস্ত শত্রুভূত অন্ধকারকে অতিক্রম করে। প্রকাশসেচক আত্মারূপ সোমের প্রকাশ-ধারা ভাসমান হয়। তেজ দ্বারা আরোচমান " পাপপ্রবৃত্তিবিনষ্টকারী তুমি " এই আত্মারূপ সোম আমাদের মন, বুদ্ধি আদিকে পবিত্র কর; যখন তুমি প্রভূত স্তুতিযুক্ত কর্মের সাথে এবং প্রশংসনীয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তমুখ প্রাণের সাথে সব রূপধারী মানবকে প্রাপ্ত হও ।

অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ।
সং সূর্যেণ দিদয়ুতে ॥
সামবেদ ৪৯৭

সরলার্থঃ পরমেশ্বর জীবাত্মাকে আহ্বান করে- হে মেধাবী উপাসক ! আমাকে একবার আপন করেই তো দেখো। দেখো আমি কিভাবে- ১.তোমার জন্য সুখের বর্ষক হই, কিভাবে তোমাকে শক্তিশালী করি। ২." আমি তোমার দুঃখসমূহের হরণকারী, সকল মলিনতা -তামসিকতাকে দূরকারী"। তোমার শরীরকে যেমন শক্তিশালী করি সেভাবেই মনকে করি নির্মল। ৩.আমি তোমার হৃদয়কে উপাসনার ইচ্ছা দ্বারা পরিপূর্ণ করি কিংবা উদার করি। ৪.আমার দ্বারা তুমি সূর্যের ন্যায় দর্শনীয় হও-তেজস্বী হও। পরমেশ্বরের কৃপা দ্বারা মেধাবী উপাসক নিজের চোখ-দৃষ্টিকোণ দ্বারা সম্যকরূপে উজ্জ্বল হয়। অর্থাৎ এহেন ভক্তের দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত সুন্দর হয়। সে সংসারে বুদ্ধি দ্বারা ও বুঝেশুনে জীবন নির্বাহ করে ।

কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্য়তঃ কৃণুতে নির্ণিজং গামতো মতিং জনয়ত স্বধাভিঃ ॥
সামবেদ ৫৩০

সরলার্থঃ " পাপপ্রবৃত্তির হরণকারী পরমেশ্বর " মানবজাতিকে জীবাত্মার সাথে সংযুক্ত হয়ে কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ প্রদান করেন। কামনাযোগ্য নিজ মিত্র উপাসক মানবের হৃদয় অভ্যন্তরে স্থিত তিনি পবিত্রতা দান করেন। মুমুক্ষু উপাসকগণের দ্বারা হৃদয়ে উদ্দেশ্যকৃত সেই পরমাত্মা ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধি করেন। এই কারণে, হে মানব ! তুমি আত্মসমর্পণের সাথে, সেই পরমেশ্বরের প্রতি স্তুতি প্রকাশ করো।

পবতে হর্য়তো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা ।

অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ ॥

সামবেদ ৭৭৩

সরলার্থঃ কামনা যোগ্য, অজ্ঞান, " পাপপ্রবৃত্তি আদির হর্তা জগদীশ্বর " দ্রুততার সহিত অতি কুটিলতাকে পার করে উপাসককে পবিত্র করে থাকে । হে জগদীশ্বর ! তুমি স্তুতিকারী উপাসকের জন্য বীরভাবের দ্বারা যুক্ত কীর্তি প্রাপ্ত করাও ।

অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া ।

যুজং বাজেষু চোদয় ॥

সামবেদ ৮০৫

সরলার্থঃ হে পবমান সোম ! হে পবিত্রকর্তা পরমাত্মা ! আমরা তোমাকে মেধা দ্বারা অবগত হই। " হে দুঃখ ও পাপপ্রবৃত্তিসমূহের হরণকর্তা ! " গতিশীল তুমি আনন্দ ধারার দ্বারা স্তুতিকারী আমাকে পবিত্র কর। হে পরমাত্মা, আমি তোমার মিত্র ! জীবন সংগ্রামে বিজয় প্রাপ্তির জন্য আমাকে প্রেরণ কর ।

উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ ।

যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনৌ কলশেষু সীদতি ॥

সামবেদ ৮৮৭

সরলার্থঃ স্থির, অজর, অমর, সনাতন পবিত্রকর্তা পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক দিব্য প্রকাশ-কিরণ প্রাত-সন্ধ্যা উভয় সময়েই, সন্ধ্যা-বন্দনার সময় উপাসক প্রাপ্ত হয়। যখন " দোষ হরণকারী পরমাত্মা " পবিত্র হৃদয় গৃহে ভক্তিভাবরূপ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, তখন হৃদয়রূপ গৃহে স্থিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় আদি কোষে স্থিতি-লাভ করে, এবং উহাতে স্থিত আত্মা, মন, বুদ্ধি আদি সবাইকে প্রভাবিত করে ।

ত্বাং রিহন্তি ধীতয়ো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ ।

বৎসং জাতং ন মাতরঃ পবমান বিধর্মণি ॥

সামবেদ ১০১৭

সরলার্থঃ " হে পবিত্রতাদায়ক রস ভণ্ডার জগদীশ্বর পাপপ্রবৃত্তি হরণকারী " তোমাকে বিশেষরূপে সদগুণের ধারক পবিত্র অন্তরাত্মাতে দ্রোহরহিত ধী-বৃত্তিসমূহ ধ্যান করে, নবজাত বাছুরকে যেভাবে গো মাতা চাটতে থাকে।

স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ । অভি যোনিং কনিক্রদৎ ॥

সামবেদ ১২৯৩

সরলার্থঃ সেই বিশেষ দ্রষ্টা, দিব্য গুণ-কর্ম-স্বভাবের ধারণকারী, ❝ পাপপ্রবৃত্তি হরণকারী পরমেশ্বর ❞ উপদেশ দিয়ে নিজের নিবাসগৃহভূত জীবাত্মাকে লক্ষ্য করে পবিত্র হৃদয় মধ্যে পৌঁছে ।

এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ । পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥

সামবেদ ১২৯০

সরলার্থঃ এই বলবান, আনন্দবর্ষক, ❝ পাপপ্রবৃত্তিকে হরণকারী রসময় পরমেশ্বর ❞ জীবাত্মাকে চারি দিক থেকে পবিত্র করে মনোময় কোষে প্রবাহিত হচ্ছে ।

এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ । ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥

সামবেদ ১২৭৫

সরলার্থঃ ধারণাবতী বুদ্ধিতে অধিক বৃদ্ধি হয়ে উপাসকের ধ্যানবৃত্তিসমূহ এই ❝ দোষহর্তা রসনিধি পরমেশ্বরকে ❞ জীবাত্মা দ্বারা পান করার জন্য প্রণব-জপ আদি প্রেরিত করে ।

এছাড়াও অন্যত্র নানা স্থালে 'হরি'র কথা উল্লেখ পাওয়া যায় -

১। ঋগ্বেদ ১০।৪৯।১১ ' হরিবঃ' = দুঃখহরণকারী পরমাত্মা

২। ঋগ্বেদ ১০।৭৯।৬ 'হরিঃ' = সংহারক

৩। ঋগ্বেদ ১০।৯৬।১ 'হরিভিঃ' = মানব দ্বারা উপাসিত পরমাত্মা

৪। ঋগ্বেদ ১০।৯৬।৩ ' হরিতঃ' = দুঃখহরণকারী, 'হরিঃ' = অজ্ঞান হরণকারী

' হরিবঃ ইন্দ্র' = দুঃখহর্তা পরমাত্মা

৫। ঋগ্বেদ ৮।২৪।৩,৫ ঋগ্বেদ ৮।৬১।৩ 'হরিবঃ ' = হে সংসাররক্ষক দেব, হে জগতাধিপতি

... ইত্যাদি ইত্যাদি ।

তাই, হে ভগবৎ ভক্তবৃন্দ ! আসুন বেদমাতার নির্দেশ অনুসরণ করি -

মা চিদন্যদ্বি শংসত [সামবেদ ২৪২]

= ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু বা কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ, উপাসনা করে বিপর্যস্ত হয়ো না।

সাহায্যকারী গ্রন্থঃ

১। সামবেদ - ড. রামনাথ বেদালঙ্কার

২। ঋগ্বেদ - স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক বিদ্যামার্তণ্ড

৩। সত্যার্থ প্রকাশ - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী [ড. সুরেন্দ্রকুমার সম্পাদিত]

গুরু যদি পাপ করে শিষ্যদের কী করণীয় ?

মানবজীবনে গুরু ২ প্রকার। একজন পরমগুরু অর্থাৎ পরমেশ্বর আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মাত পিতা আচার্যসহ সকল সদুপদেশদাতা। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী 'আর্যোদ্দেশ্যরত্নমালা' গ্রন্থের ৬১ সংখ্যক রত্নে বলেছেন -

বীর্যদান হতে আরম্ভ করে ভোজনাদি দিয়ে পালন করেন বলে পিতাকে 'গুরু' বলা হয়। যিনি স্বীয় সত্যোপদেশ দ্বারা হৃদয়ের অজ্ঞানরূপী অন্ধকারকে দূর করে দেন, তিনি ''গুরু'' অর্থাৎ 'আচার্য'।

সত্যার্থ প্রকাশের স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশঃ অংশেও বলেছেন -

মাতা এবং পিতা 'গুরু'; তদ্ব্যতীত যাঁর উপদেশে সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জন করা হয় তাঁকেও 'গুরু' বলে।

যোগদর্শনে ভগবান্ পতঞ্জলি বলেছেন -

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

[যোগদর্শন ১।২৬]

শব্দার্থ - (সঃ এষঃ) সেই ঈশ্বর (পূর্বেষাম্) পূর্বে উৎপন্ন গুরুদের (অপি) ও (গুরুঃ) গুরু অর্থাৎ বিদ্যা দাতা (কালেন-অনবচ্ছেদাৎ) সময় দ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত না হওয়ায়।

সূত্রার্থ - সেই ঈশ্বর পূর্বে উৎপন্ন গুরুদেরও গুরু অর্থাৎ বিদ্যা দাতা, তার কারণ হল কালের দ্বারা তিনি কখনো মৃত্যুকে প্রাপ্ত হননা।

ব্যাখ্যা - এই সূত্রেও ঈশ্বরের স্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে।পূর্ববর্তী গুরুরা সময় দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছেন কিন্তু ঈশ্বরকে নষ্ট করার জন্য কালের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। এই জন্য তিনি সকল গুরুদেরও গুরু। যেমন এই সৃষ্টির আরম্ভে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই রকম অতীত সৃষ্টিতেও দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও দেবেন, এরকম জানা উচিৎ।

গুরু সম্পর্কে পবিত্র বেদ বলছে -

তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ ।

সূরাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥

[সামবেদ ১১০২]

সরলার্থঃ যারা পবিত্র, বিদ্বান, জ্ঞানের ধারণকর্ত্তা ও পরিপক্ব, পরমাত্মাতে আশ্রিত, সূর্যের ন্যায় দর্শনীয় অর্থাৎ কান্তিমান অধ্যাত্ম সত্যের মার্গ তথা দৃষ্টি প্রদানকারী, গতিমান্ ও কর্মণ্য, ধীর এবং বিবেকবান তারাই বিনয় , বিদ্যা, ধর্ম, আদির প্রেরণা দানকারী বিনয়স্বভাবযুক্ত গুরু হবেন ।

গুরু কে হবেন -

https://www.agniveerbangla.org/2022/06/blog-post_13.html?m=1

আমাদের পূর্ব আচার্যগণ কিংবা ঋষিরা কখনোই নিজেকে ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করতেন না । তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে আচার্য স্নাতক বিদ্যার্থীকে বলেছেন -

য়ান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। য়ান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ শিক্ষাবল্লী একাদশ অনুবাক]

অনুবাদঃ যে সকল অনিন্দিত কর্ম সেসবই তোমার সেবন করা উচিত, দোষযুক্ত নয়। যেগুলি আমাদের বেদানুকূল কর্ম সেগুলি তোমার অনুকরণ করা উচিত, অন্য সমস্ত নয় ।

অর্থাৎ পিতা - মাতা - গুরুদের যে সকল বেদানুকূল কর্ম সেগুলিই তোমার অনুসরণ করা উচিত, নিন্দিত কর্মের নয়। তাদের মধ্যে যে সকল দৈবীসম্পত্তির গুণ রয়েছে সেসবই তোমার ধারণ করা উচিত, অন্য গুণ নয়। যদি তোমার মাতা, পিতা তথা আচার্যের মধ্যে কোন অদৈবীসম্পত্তির গুণ থাকে তো, তাদের অনুকূলে চলা তোমার উচিত নয় ।

সিদ্ধান্তে বলা যায়, আচার্য কোন ভুল করলে ও তার জন্য অনুতপ্ত হলে তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ভগবান্ মনু বলেছেন -

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাহধ্যয়নেন চ।

পাপকৃন্মুচ্যতে পাপা তথা দানেন চাপদি ॥

[মনুস্মৃতি ১১।২২৮]

অনুবাদঃ
[১] (খ্যাপনেন) নিজের ত্রুটি এবং তার জন্য দুঃখের অনুভব করার মাধ্যমে সর্বসাধারণের সামনে নিজের কৃত দোষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে [১১.২২৮]
[২] (অনুতাপেন) অনুতাপ করার মাধ্যমে [১১.২২৯-২৩২]
[৩] (তপসা) ব্রতের [১১.২১১-২২৫] সাধনায়
[৪] (অধ্যয়নেন) বেদাভ্যাস [১১.২৮৫-২৮৬]
(পাপকৃৎ পাপাৎ মুচ্যতে) পাপকারী পাপ ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যাব (তথা) এবং
[৫] (আপদি) আপদ্-গ্রস্ত ব্যাধি, জরা আদি থেকে পীড়িত অবস্থার মধ্যে অপরাধ হওয়ার পর (দানেন) প্রায়শ্চিত্ত-হেতু সংকল্প এবং পরোপকারার্থ দান দেওয়ার পুণ্য থেকেও পাপ ভাবনা সমাপ্ত হয়ে নিষ্পাপভাব আসে ।

আরো পড়ুন ❝ পাপ থেকে রক্ষার উপায় কী ❞ -

https://www.agniveerbangla.org/2022/05/blog-post_23.html?m=1

সুতরাং,

১। আচার্য বা গুরু সম্পর্কে ত্রুটি বিবেচনার পূর্বে এই সংকল্প ও চিন্তা রাখা আবশ্যক যে তিনিও মানুষ । বেদ বলছে -
আগঃ পুরুষতা করাম
[যজুর্বেদ ১৯।৬২]
- মানুষ বলেই আমরা ভুল-ত্রুটি করি ।
অতঃ তিনি যদি ভুল করেন তা কোন পরিস্থিতিতে, কেন এবং তা আদৌ ভুল বা পাপ সংজ্ঞাবাচ্য কিনা তা বিবেচনা করতে হবে । কেননা অনভিজ্ঞের নিকট সঠিক ও ভুল বিচার করার সক্ষমতা থাকে না ।
২। মানবীয় কারণে যদি তা ভুল সাব্যস্ত হয় তবে কী তা গুরুতর নাকি এককালীন ? আচার্য বা গুরু কী সেই ত্রুটি মেনে নিয়ে মহর্ষি মনু প্রদত্ত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করছেন ? যাস্ক নিরুক্তে [৬।২৭] সপ্ত মর্যাদার ব্যাখ্যায় বলেছেন ' পুনঃ পুনঃ পাপ করা ' । অতঃ যদি আচার্য বা গুরু নিজেকে সংশোধন করে নেন তবে তা শ্রেয় । কিন্তু যদি আচরণ করতেই থাকেন তবে তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য ।

৩। গুরুত্যাগ - পূর্বোক্ত বিন্দুতে আমরা যে দুইটি বিষয়ে আলোচনা করেছি তার অনুসিদ্ধান্তে বলা যায়, যদি গুরু ক্রমাগত অসদাচার, মিথ্যাচার ও ব্যসনে লিপ্ত থাকেন তবে সেই গুরু অবশ্য ত্যাজ্য । আর যদি গুরু স্বীয় ত্রুটির জন্য অনুতাপকারী ও প্রায়শ্চিত্তকারী হন তবে অন্যাদি মানবের ন্যায় তিনিও ক্ষমার্হ । সাধারণ মানব হয়ে তার ত্রুটির বিবেচনা করা দুঃসাহসিক কর্ম তাই তাঁর পরবর্তী আচরণ ও কর্মশৈলীই জানাবে ।

৪। যদি গুরুর ত্রুটি অনৈচ্ছিক কিংবা সাময়িক স্থিতিকালে হয় তবে তৈত্তিরীয় উপনিষের শিক্ষা অনুযায়ী গুরুর ভালোগুণ গ্রহণ ও খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে হবে । তার দোষকেও মানবীয় ত্রুটি হিসেবে নিয়ে গুরুকে সদাচারে পুনঃপদচালনার সঙ্গী হওয়া আবশ্যক ।

৫। গুরুদেব স্বীয় ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে শিষ্যদের উপদেশ দেবেন । কেননা তিনি যেহেতু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই শিষ্যগণও যেন ভবিষ্যতে কখনো ভুল না করেন তার জন্য এহেন গুরু উপদেশই কার্যকরী । কেননা তিনি ভ্রান্তি থেকে সত্যে আগমন করার ফলশ্রুতিতে শুদ্ধতার পথে আরোহণ করে চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহন করেছেন ।

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর [সামবেদ ২৫৯]

- হে ভগবান ! আমাদের প্রজ্ঞা দান করো ।

পাশাপাশি পড়ুন গুরুগিরি গ্রন্থটি -

https://drive.google.com/file/d/1AzXq3_fDO0SMUFU5178alGTv5uoN2jfz/view?usp=sharing

বিবাহ কত ধরনের হয় ? শাস্ত্রে ৮ ধরনের বিয়ের কথা আছে তা কী কী ?

মানুষের শরীর, মন ও আত্মার ক্ষুধা নানাবিধ – জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষুধা, ধনরত্নের ক্ষুধা মানসম্মানের ক্ষুধা বা প্রভাবপ্রতিপত্তির ক্ষুধা। এইসব ক্ষুধার নিবৃত্তি নর বা নারী একা একাও করতে পারে। এমন কতকগুলো ক্ষুধা আছে, যার নিবৃত্তি পুরুষ বা নারী একা একা করতে পারে না। তাতে নর ও নারীর মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই নর ও নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় ও দাম্পত্য জীবন যাপন করে। দাম্পত্য জীবন ব্যতিরেকে এইসব ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য উপায় নেই ।
এইসব ক্ষুধা নরনারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত। এই ক্ষুধাগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে- প্রথম যৌন ক্ষুধা, দ্বিতীয় সংসার রচনার ক্ষুধা, তৃতীয় সন্তান লাভের ক্ষুধা, চতুর্থ সামাজিকতার ক্ষুধা ও পঞ্চম আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। বিবাহের উদ্দেশ্য এই পঞ্চবিধ ক্ষুধার নিবৃত্তি। পতি ও পত্নী যদি বিবাহের মূল উদ্দেশ্য এই পঞ্চবিধ ক্ষুধাকে না জানে, তবে তাহাদের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হয় । এই পঞ্চবিধ ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য নর নারীর প্রতি এবং নারী নরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত, বৈধ, সীমাবদ্ধ ও উপযোগী করার জন্যই পরমেশ্বর বিবাহ বিধান প্রণয়ন করেছেন । জগতের অতি অল্প লোকই যৌন ক্ষুধাকে জয় করতে পেরেছে ।

যৌবনে এই ক্ষুধা নর ও নারীর প্রবল থাকে। এমন কি অনেকের পক্ষে তা সীমাকেও অতিক্রম করে। প্রাপ্তবয়স্ক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের মধ্যেই যৌন ক্ষুধার অস্তিত্ব আছে। বিবাহিত জীবনে পতি ও পত্নীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক মিলনেই এই যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। পতি বা পত্নীকে অতিক্রম করে নারী বা নরের যে অন্যত্র শারীরিক মিলন, তা অবৈধ। তাতে মানসিক ও আত্মিক মিলন অসম্ভব। অবৈধ শারীরিক মিলনে বা অবৈধ সন্তান সৃষ্টিতে সমাজ ও পরিবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৈধভাবে মানবাত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই বিবাহ বিধানের প্রয়োজন ।

ভগবান মনু তাঁর মনুস্মৃতিতে ৮ প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন । মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় ‘সংস্কারবিধি‘ গ্রন্থের অন্তর্গত ’বিবাহপ্রকরণম্’-এ বিবাহ সম্পর্কিত শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন । যথা -

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহ্যধমঃ ।। ৩.২১ ।।

অর্থাৎ, বিবাহ আট প্রকার, যথা- ব্রাহ্ম, , দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ ।

চারটি উৎকৃষ্ট বিবাহ -

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্ ।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ।। ৩.২৭ ।।
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে ।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে ।। ৩.২৮ ।।
একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে ।। ৩.২৯ ।।
সহোভৌ চরতাং ধর্মং ইতি বাচানুভাষ্য চ ।
কন্যাপ্রদানং অভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ।। ৩.৩০ ।।

(১) কন্যাকে বস্ত্রাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করে এবং কন্যাও যাকে পছন্দ করেছে সেই উত্তম, সুশীল, বিদ্বান ও কন্যার যোগ্য পুরুষকে আহ্বান করে আদর অভ্যর্থনা সহকারে কন্যাদান করাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে।
(২) বিরাট যজ্ঞে বড় বড় বিদ্বানকে বরণ করে তাতে ঋত্বিক কর্মে নিযুক্ত কোন বিদ্বানকে বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা সুশোভিতা কন্যা দান করলে তা হয় দৈববিবাহ ।
(৩) বরের নিকট হইতে ১ (এক) জোড়া বা ২ (দুই) জোড়া গাভী ও বলদ নিয়ে তাকে ধর্মপূর্বক কন্যাদান করার নাম আর্ষবিবাহ । [একথা মিথ্যা, কেননা পরে মনুস্মৃতিতে (৫।৪৫-৪৮) নিষেধ করা হয়েছে এবং তা যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। অতএব, কিছু আদান-প্রদান না করে উভয়ের প্রসন্নতা সহকারে পাণিগ্রহণ করাই আর্ষ বিবাহ]
(৪) যজ্ঞশালায় যথাবিধি যজ্ঞ করে সকলের সম্মুখে-“তোমরা উভয়ে মিলে যথাবিধি গৃহাশ্রম কর্ম করতে থাক” এইরূপ বলার পর উভয়ের সানন্দে পাণিগ্রহণ হওয়াকে প্রাজাপত্যবিবাহ বলে।

চারটি নিকৃষ্ট বিবাহ

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে ।। ৩.৩১ ।।
ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ।। ৩.৩২ ।।
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদন্তীং গৃহাৎ ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ।। ৩.৩৩ ।।
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ।। ৩.৩৪ ।।

(৫) বরের জ্ঞাতিবর্গকে ও কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়ে হোমাদি বিধিদ্বারা কন্যাদান করাকে আসুরবিবাহ বলে ।

(৬) বর ও কন্যার ইচ্ছানুসারে উভয়ের যে সংযোগ হয় এবং কামাসক্ত হয়ে উভয়ে মনে মনে স্বীকার করে নেয় যে, তারা উভয়ে স্ত্রী- পুরুষ—এরূপ বিবাহকে গান্ধর্ববিবাহ বলে।

(৭) হনন ও ছেদন অর্থাৎ কন্যাপক্ষীয় বাধাদানকারীদিগকে বিদীর্ণ করে বিলাপকারিণী, রোরুদ্যমানা, কম্পিতকলেবরা ও ভীতিপরায়ণা কন্যাকে বলাৎকারে হরণ করে বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

(৮) নিদ্রিতা, উন্মাদগ্রস্তা বা মদ্যপানে উন্মত্তা কন্যাকে একান্তে পেয়ে তাকে দূষিত করা—তা সব বিবাহের মধ্যে নীচ হইতেও নীচ, মহানীচ, দুষ্ট, অতিদুষ্ট পৈশাচবিবাহ ।

১ম ৪টি বিবাহে কী লাভ ?

ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্বশঃ ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥
মনুস্মৃতি ৩।৩৯

অর্থাৎ, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য- এই ৪ (চার) প্রকারের বিবাহে পরস্পর পাণিগ্রহণে আবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ থেকে যে সব সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা বেদাদি বিদ্যায় তেজস্বী, আপ্ত পুরুষের মতানুকূল ও অত্যুত্তম হয় ।

রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ ।
পর্যাপ্তভোগা ধর্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ ॥
মনুস্মৃতি ৩।৪০

অর্থাৎ, সেই সব পুত্র বা কন্যা সুন্দর রূপ, বল ও পরাক্রমযুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধি, উত্তম গুণ ও বহুধনযুক্ত; পুণ্য কীর্ত্তিমান, পূর্ণভোগের ভোক্তা ও অতিশয় ধর্মাত্মা হয়ে ১০০ (শত) বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ।

পরবর্তী ৪টি বিয়ে কেন করা উচিত নয় ?

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা ।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্বিবর্জয়েৎ ॥
মনুস্মৃতি ৩।৪১-৪২

অর্থাৎ, এই চার প্রকার বিবাহ বাদে অবশিষ্ট— আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই ৪ (চারি) প্রকারের দুষ্ট বিবাহে উৎপন্ন সন্তান নিন্দিত কর্মের কর্তা মিথ্যাবাদী, বৈদিক ধর্মের বিদ্বেষী ও নীচ স্বভাবযুক্ত হয় । এজন্য যে সব নিন্দিত বিবাহে সন্তান নীচ হয়, তা ত্যাগ করে যে সব উত্তম বিবাহে সন্তান উত্তম হয়, তা-ই করা অত্যুত্তম কার্য ।

অতঃ সনাতন ধর্মালম্বী মাত্রেই আর্যশাস্ত্রীয় বিধিবিধান অনুযায়ী উৎকৃষ্ট বিবাহ করা উচিত ।

আরো পড়ুন " কন্যার বর নির্বাচন অধিকার " ~

https://www.agniveerbangla.org/2023/02/blog-post_22.html?m=1

গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক করুণানিধি শ্রীমৎ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

গোরক্ষা আন্দোলন কী?

গোরক্ষা আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। তদুপরি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধার্মিক আন্দোলনও বটে। এই আন্দোলনের মূল সিদ্ধান্ত হলো গবাদি পশু বিশেষত গো জাতিকে রক্ষা করা। যেমন- গোরুকে হত্যা না করা, হত্যা করতে না দেওয়া, গোরুর পালন পোষণ করা ইত্যাদি।

গোরক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব

ধর্মীয় গুরুত্ব-

সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সনাতনীরা কখনোই গোহত্যা করেন, কোনো কালে করতেনও না। বিপরীত দৃশ্যপটে এদেশের বহিরাগত মতাবলম্বীরা মাংসভোজন এবং কট্টর হিন্দুবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ করার জন্য গোহত্যা করে এসেছে।

যেমন, ভারতবর্ষে আক্রমণকারী মুসলমান শাসকদের হিন্দুবিদ্বেষের একটি অন্যতম উপায় ছিল গোহত্যা। তাদের মানসিকতা ছিল এমন যে, গোরু হিন্দুর শ্রদ্ধেয় প্রাণী। সুতরাং একে মারলে মন্দির ভাঙার মতোই হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে। তাই একে মারো। তারা যে গোমাংসভোজীও ছিল তা বলাই বাহুল্য। সে সময়ে হিন্দুদের ধর্মভ্রষ্ট করতে বা মন্দির অপবিত্র করতে গোমাংসের প্রয়োগের ঘটনাও একদম অস্বাভাবিক ছিল না। উক্ত বিষয়ে আলাদা কোনো প্রবন্ধ লিখা যায়।

ইংরেজরা যখন পাঞ্জাব অধিকার করেছিলো তখন তারা স্থানে স্থানে কসাইখানা খুলে অসংখ্য গোরুর হত্যা করতে থাকে। এর প্রতিবাদে নামধারী শিখ সম্প্রদায় সরাসরি ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন কসাইখানা থেকে গোরুদের মুক্ত করে দেয়। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ম্লেচ্ছরা শিখদের বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করে। বলা হয় উক্ত বিদ্রোহে প্রায় ৬৬ জন শিখ বীরগতিপ্রাপ্ত হন। ইতিহাসে এই ঘটনা কুকা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। [উইকিপিডিয়া]

এভাবে বহিরাগত যবন জাতিগোষ্ঠী সবসময় সনাতনীদের মর্মে আঘাত করার জন্য গোহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং গোরক্ষা সনাতনীদের জন্য কেবলমাত্র একটি সামাজিক আন্দোলন নয় বরং ধর্মীয় আন্দোলনও বটে।

গোরক্ষা আদিকাল থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আন্দোলন হওয়ার সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ যে কারণ তা হলো সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বেদের আদেশ। বেদের বহুস্থলে গোরক্ষার আদেশ আছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটা বেদমন্ত্রের ভাবার্থ উদ্ধৃত করছি-

• জ্ঞানবান পুরুষের নিকট আমি বলেতেছি নিরপরাধ অহিংস পৃথিবী সদৃশ গো জাতিকে হত্যা করবে না।

[ঋগ্বেদ ৮।১০১।১৫]

• বনস্পতি আমাদের জন্য মধুময় হউক। সূর্য আমাদের জন্য মধুময় হউক। গো জাতি আমাদের জন্য মাধুর্যময় হউক। [ঋগ্বেদ ১/৯০/৮।]

• সত্য রক্ষক পুরুষেরা আমাদের হিতকারী হউন। অশ্ব ও গো আমাদের সুখদায়ক হউক। বুদ্ধিমান সৎকর্ম্মা শিল্পী আমাদের সুখদান করুন। অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্মে জ্ঞানীগণ আমাদের জন্য সুখদায়ক হউন।

[ঋগ্বেদ ৭/৩৫/১২]

• হে প্রকাশময় পরমাত্মন্ ! এই ভাবে তুমি আমাদিগকে শুদ্ধ কর। গোজাতি, মনুষ্যজাতি, অশ্বজাতি ও ওষধি সমূহের জন্য কল্যাণকর।

[সামবেদ উত্তরার্চিক-১/১]

• গোরু অদিতি, সে অবধ্য, তাকে হিংসা করো না। [যজুর্বেদ- ১৩/৪৩]

• হত্যার অযোগ্য গোরুকে কখনো মেরো না।

[যজুর্বেদ ১৩/৪৯]

• গো ঘাতকদের জন্য মৃত্যুদণ্ড রয়েছে।

[যজুর্বেদ ৩০/১৮]

• নির্দোষের হত্যা অবশ্যই ভয়ানক। আমাদের গো, অশ্ব, পুরুষকে মেরো না। [অথর্ববেদ ১০/১/২৯]

• হে ধেনু সকল! তোমরা কৃশ মনুষ্যকে হৃষ্ট পুষ্ট কর।বিশ্রী মনুষ্যকে সুশ্রী কর। গৃহকে মঙ্গলময় কর।তোমাদের রব মঙ্গলময়। সভা সমুহে তোমাদের বহু গুণ বর্ণনা করা হয়।

[অথর্ব্ববেদ ৪/২১/৬]

• যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের সমাজের মধ্যে যেন বীরদের বিনাশকারী কেহই না থাকে।

[অথর্ব্ববেদ ১/১৬/৪।]

• এই গোশালায় ধেনু সকল নির্ভয়ে থাকুক, একসঙ্গে মিলিয়া বিচরণ করুক, গোময় উৎপন্ন করুক, অমৃতময় দুগ্ধ ধারণ করুক এবং নীরোগ হইয়া আমার নিকট আসুক।

[অথর্ব্ববেদ ৩/১৪/৩]

আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব-

ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক দেশ। আর কৃষিভিত্তিক কোনো অর্থনীতিতে গবাদি পশুর পালন-পোষণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে পরাধীন এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে থাকা ভারতবর্ষে হয়েছিল তার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ গোরক্ষার দিকে কেউই মনোযোগ দেয় নি, বরং মুসলমান বা ইংরেজ শাসনামল। উভয় সময়েই এদেশে বিপুল সংখ্যক গো মাংসভোজী এসে বাস করেছে । তারা অসংখ্য কসাইখানা খুলে অবাধে গোহত্যা করেছে। এভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে গোহত্যা চলতে থাকায় কৃষ্যাদি কর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। যার পরিণামস্বরূপ কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবনতি যেমন- দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই সমস্যাগুলো প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। গবাদি পশুকে যত্নসহকারে রক্ষা করা এবং কৃষিকাজে উন্নতি করার মাধ্যমেই এসব সমস্যার সমাধান হতে পারতো।

উক্ত বিষয়ে মহর্ষির জীবনী লেখকগণের দেওয়া তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেমন- পণ্ডিত ঘাসীরাম জী লিখেছেন,

স্বামীজি (মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ জী) বললেন, “দেশে হাজারো গোরুকে প্রতিদিন হত্যা করা হয়। এতে দেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এ কারণেই এই দেশ দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের শাসকরা এর উপর কোনও মনোযোগ দেয় না।”

[পণ্ডিত ঘাসীরাম কৃত, " মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন-চরিত। দ্বিতীয় ভাগ/ চতুর্বিংশ অধ্যায় / পৃষ্টা ৫৭১]

“ এক ব্যখ্যানে স্বামীজি বলেছিলেন, আজকাল দুধ, ঘি ইত্যাদি পদার্থের মূল্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। এখন এসব কিনে খাওয়ার সামর্থ্য অনেক লোকের নেই। গুজরাটের গ্রামগুলোতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা দুধ, দই ইত্যাদি কখনো মুখে দিয়ে দেখতে পারে না।সেখানকার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের কথা শুনলে বোঝা যায় যে, পুরানো সময়ের সাপেক্ষে বর্তমানে এসব পদার্থ কতোটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।”

[পণ্ডিত ঘাসীরাম কৃত, " মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন-চরিত। দ্বিতীয় ভাগ/ সপ্তবিংশ অধ্যায় / পৃষ্টা ৬৫৭]

“ স্বামীজি দেখলেন, গোরক্ষাই আর্যাবর্তের উন্নতির মূল গোহত্যার কারণে দেশের ভয়ংকর ক্ষতি হচ্ছে। দুধ ঘি ইত্যাদি পদার্থের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ লোক অনাহারে দিনাতিপাত করছে। এতে তাদের শরীর দুর্বল হচ্ছে, বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। কৃষিকাজের জন্য এখন আর হৃষ্টপুষ্ট বলবান ষাঁড় পাওয়া যায় না, ধীরে ধীরে ষাঁড়ের সংখ্যাও কমে আসছে। কৃষকরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। ”

[পণ্ডিত ঘাসীরাম কৃত, " মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কা জীবন-চরিত। দ্বিতীয় ভাগ / সপ্তবিংশ অধ্যায় / পৃষ্টা– ৬৬৭]

মহর্ষির স্বরচিত গ্রন্থ গোকরুণানিধিঃ তে তিনি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে লিখেছেন,

“ প্রমাণিত হইল যে গবাদি পশুর বিনাশ হইলে রাজা এবং প্রজার ও বিনাশ হয়। কারণ, পশুর সংখ্যা হ্রাস পাইলে দুগ্ধাদি পদার্থ এবং কৃষি কার্য্যাদিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দেখো এই জন্যই যে মূল্যে যে পরিমাণ দুগ্ধ ঘৃতাদি পদার্থ ও বৃষাদি পশু সাতশত বৎসর পূর্বে পাওয়া যাইত সেই পরিমাণে দুগ্ধ-ঘৃতাদি পদার্থ এবং বৃষাদি পশু আজ কাল দশ গুণ মূল্যেও পাওয়া যায় না। কারণ গত ৭০০ সাত শত বৎসরের মধ্যে এই দেশে গবাদি পশুর হন্তা মাংসাহারী বিদেশী বহু সংখ্যায় আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা ঐ সব সর্বহিতকারী পশুর হাড় মাংস পর্যন্তও ছাড়ে না। “নষ্টে মূলে নৈব পত্রং ন পুষ্পম্” কারণের নাশ করিয়া দিলে কার্যের নাশ কেন হইবে না।”

বেদে আত্মরক্ষা ও প্রত্যাঘাতের আদেশ

আত্মরক্ষার অধিকার (Right of Private Defence) আত্মরক্ষা বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। একজন ব্যক্তি তার শরীর ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনো কাজ করলে তা আত্মরক্ষা বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ করতে গিয়ে কারো কোনো ক্ষতি হলে আইনের চোখে অপরাধ না। আইনানুযায়ী ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে কোনো কাজ করা হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না ।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এ 'সাধারণ ব্যতিক্রম' (General Exception) পরিচ্ছেদে (৯৬-১০৬ নং ধারা) বর্ণিত বিশেষ ব্যক্তি অধিকার যা দ্বারা কেউ নিজের বা অপরের শরীরের আঘাত, অনিষ্ট, বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধে অথবা নিজের বা অপরের সম্পত্তি রক্ষার্থে বল প্রয়োগ করতে পারে। এই অধিকার প্রয়োগে অপরাধীর কোনো ক্ষতি হলে ৯৯ নং ধারা ব্যতিক্রম সাপেক্ষ তা আইনের চোখে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ক্ষতিসাধনকারী কাজটি একটি অপরাধ হতে হবে। আইনের দৃষ্টিতে যদি অপরাধ না হয় তবে এ ধারায় অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না ।

আত্মরক্ষার অধিকার (Right to Self Defence or private defence): দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৯৬-১০৬ অনুযায়ী যদি কোন বেআইনী আক্রমন হতে নিজের দেহ, সম্পত্তি বা অন্য কারো দেহ বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন অপরাধ করে তা দন্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না অর্থাৎ কোন শাস্তি পেতে হবে না ।

বৈদিক শাস্ত্রে যুদ্ধবিধির বহুধা উল্লেখ পাওয়া যায় । স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে বেদে কি বলা হয়েছে আত্মরক্ষা নিয়ে । কেননা প্রতিদিনকার মানব জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন কিনা আমরা নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও অন্য ব্যক্তির দ্বারা নানা রকম আক্রমণ কিংবা অপরাধের শিকার হই । পবিত্র বেদ বলছে -

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥
ঋগ্বেদ ১।৫০।১৩

অনুবাদঃ হে বিদ্বান ! যেভাবে এই অবিনাশী সূর্য উদিত হয় সেভাবে তুমি সম্পূর্ণ বল দ্বারা উত্থিত হও । যেভাবে তুমি ধার্মিক মানবের বিদ্বেষকারী শত্রুকে বিনাশ করো সেভাবেই আমিও শত্রুদের প্রতি আচরণ করবো । যে শত্রু আমাকে মারে তাকে আমিও মারবো, যে আমাকে মারবে না তাকে আমিও মারবো না ।

ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মদন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে।
পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্ ॥
ঋগ্বেদ ৪।৫০।২

অনুবাদঃ হে বৃহৎ পালক মানব ! যে হিংসক - আনন্দপ্রদাতা ধর্মাত্মাদের কম্পিতকারীদেরও কম্পিতকারী , প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত বিদ্যাদি উত্তম গুণের সিঞ্চনকারী , উত্তমগুণযুক্ত, অহিংসিত মানবদের বিনাশ করে এবং আমাদের চতুর্দিকে নাশ করে তার নিবারণ করুন । হে বৃহৎপালক ! যাকে রুদ্ধ করার মাধ্যমে বিদ্যা - আচরণের আপনি রক্ষা করেন ।

উত হন্তি পূর্বাসিনং প্রত্যাদায়াপর ইষ্বা।
উত পূর্বস্য নিঘ্নতো নি হন্ত্যপরঃ প্রতি ॥
অথর্ববেদ ১০।১।২৭

অনুবাদঃ অতি শ্রেষ্ঠ মানবই প্রথমে আঘাতকারীকে বাণ দ্বারা প্রত্যাঘাত করে । অতি শ্রেষ্ঠ মানবই প্রথমে আঘাতকারীকে নিরন্তর হনন করে ।

দেখুন বেদে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে প্রথমে আক্রমণ করবে তাকেই প্রতিহত করার জন্য । এছাড়াও এই মন্ত্রগুলোতে এটাও প্রার্থনা করা হয়েছে যারা আমাদেরকে আক্রমণ করে না এবং নিরীহ নিরপরাধ মানুষ তাদেরকে যেন আমরা ক্ষতি না করি । আরো লক্ষ করা যায় যে এই মন্ত্র গুলোতে মানুষকে বলা হয়েছে তারা যেন ধর্মের পালন এবং তার আচরণ করে অর্থাৎ এই মন্ত্রগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট যে বেদে নিরীহ মানুষের সাথে বা হিংসাত্মক মনোভাবের কোনরকম কোন বর্ণনা নেই বরং যদি কেউ আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে কিংবা প্রথমে আঘাত করে কিংবা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় প্রত্যাঘাতের ব্যবস্থা নেব ।

কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।১

অনুবাদঃ নিজের শারীরিক আরোগ্যতা সম্পাদনে প্রমাদ করবে না ।

অনেক অনুবাদে ' আত্মরক্ষায় অনবহিত হবে না ' এমন লেখা । প্রকৃতপক্ষে তাৎপর্য উভয়ক্ষেত্রে একই । গীতায় [১।৩৬] একটি শব্দ আছে ' আততায়ী ' -

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥

অনুবাদঃ এই ধরনের আততায়ীদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। সুতরাং বন্ধুবান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্রেরপুত্রদের সংহার করা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উচিত হবে না।

এছাড়াও মনুস্মৃতিতে আততায়ীর সম্পর্কে মহর্ষি মনু বলেছেন -

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্ ।

আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ৩৫০ ॥

নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ।

প্রকাশং ব্যাপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥ ৩৫১ ॥

মনুস্মৃতি ৮ম অধ্যায়

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশের ৬ষ্ঠ সমুল্লাসে এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য লিখেছেন -

গুরু হোক বা পুত্রাদি বালক, পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ অথবা বহুশ্রুত বিদ্বান, যে কেউ হোক না কেন, যিনি ধর্ম পরিত্যাগ করে অধর্মচারী হবেন এবং বিনা অপরাধে অপরকে হত্যা করবেন তাকে বিনা বিচারে বধ করবেন অর্থাৎ বধ করার পর বিচার করবেন । দুবৃর্তদের প্রকাশ্যে বধ করলে হন্তার পাপ হয় না। কারণ, ক্রুদ্ধকে ক্রোধ দ্বারা বধ করাকে ক্রোধের সাথে ক্রোধের যুদ্ধ মনে করতে হবে ।

বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে [৩।১৫-১৮] বলা হয়েছে -

আত্মরক্ষার্থে আততায়ীকে বধ করবে; এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নেই এমন বলা হয় । আততায়ী ৬ ধরনের । এ বিষয়েও বলা হয়েছে - অগ্নিদ [যে ঘরে আগুন দেয়] , বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র [হত্যার জন্য অস্ত্রধারণ করে] , ধনাপহারী [ধন অপহরণ করে] , ক্ষেত্রাপহারী

[জমি দখল করে] ও দারাপহারী [স্ত্রী হরণ করে] এই ৬ প্রকার আততায়ী । বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হয়ে আসে, তা হলে সেই হননেচ্ছু ব্যক্তিকে বধ করবে, তা ব্রহ্মঘাতী হবে না। স্বাধ্যায়সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হলে তাকে বধ করবে, তাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হবে না; কেননা, আক্রান্তের ক্রোধ আততায়ীর ক্রোধকে পরাস্ত করে।

যজুর্বেদে আততায়ী শত্রুদের পরাজিতকারীদের সৎকারের নির্দেশ রয়েছে ।

নমো রুদ্রায়াততায়িনে

যজুর্বেদ ১৮।১৮

অনুবাদঃ শত্রুদের কাঁদায় এবং উত্তমভাবে বিস্তৃত শত্রুদের পরাজিতকারী মানবকে অন্ন প্রদান করবে এবং তাদের প্রতি আমাদের নমস্কার ।

প্রবৃদ্ধো দস্যুহাভবৎ ।

ঋগ্বেদ ৮।৭৭।৩

অনুবাদঃ রাজা আততায়ী দস্যুদের দণ্ড প্রদান করবেন ।

সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে ।

ঋগ্বেদ ১০।৯৫।৮

অনুবাদঃ আমরা একত্রে রাজশক্তির মাধ্যমে আততায়ীদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করবো ।

স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যা ন উপেষে অত্রৈঃ।

ঋগ্বেদ ১।১২৯।৮

অনুবাদঃ আততায়ী শত্রুদের আমরা সর্বতোভাবে বিনষ্ট করি ।

পাশাপাশি আসুন বাংলাদেশের আইনে আত্মরক্ষার বিধিগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেই -

দন্ডবিধি আইনের ৯৯ ধারায় আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে নিজের জানমাল, অপরের জানমাল, কিংবা সরকারী সম্পত্তির যে কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য আক্রমণকারীর উপর যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তাকে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার বলা হয়। দন্ডবিধি আইনের ৯৬ ও ৯৭ ধারা।

দণ্ডবিধি আইনের ৯৯ ধারায় উল্লেখিত ব্যতিক্রমসমূহ ছাড়া আক্রমনকারীর প্রতি আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়।

দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেঃ

(১) এমন আঘাত বা আক্রমন যা প্রতিহত না করলে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুই হবে অনুরূপ আক্রমনের পরিণতি।

(২) এমন আঘাত বা আক্রমন যা প্রতিহত না করলে গুরুতর জখমের আশংকা অনিবার্য।

(৩) ধর্ষণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রাকৃত কাম লালসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

(৫) মনুষ্যহরণ বা অপহরণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ।

(৬) এমনভাবে আটক রাখার উদ্দেশ্যে আক্রমণ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের সাহায্য নিতে না পারে।

দণ্ডবিধি আইনের ১০০ ধারা - সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেঃ

চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি কিংবা অনধিকার প্রবেশ করে সম্পত্তি হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে যা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ না করলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হবে উক্ত আক্রমণের পরিণতি।

কোন তাবু, জলযান, বাসগৃহ বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্যবহৃত স্থানে অগ্নি সংযোগ করে সম্পত্তি লাভের জন্য আক্রমণ করলে। দণ্ডবিধি আইনের ১০৩ ধারা।

ইহা ছাড়া কোন নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতি সাধিত হবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটালেও কোন অপরাধ হবে না। দণ্ডবিধি আইনের ১০৬ ধারা ।

পরবর্তী পর্বে আমরা বৈদিক দণ্ডবিধি এবং রাজ আইনে কিভাবে দণ্ডপ্রদান করা হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ।

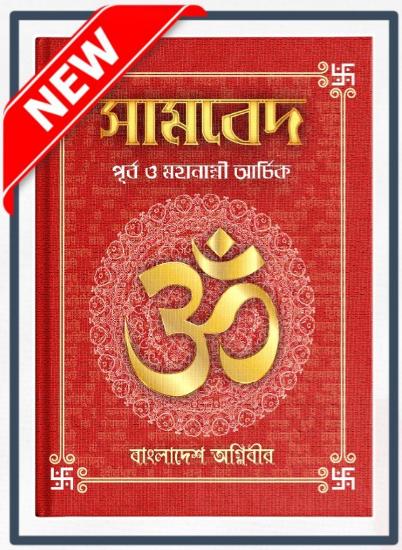

সামবেদ
৬০০ টাকা

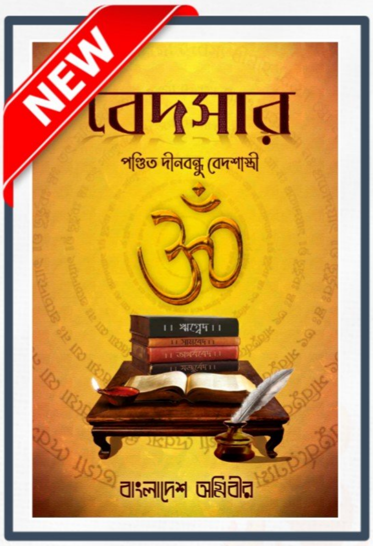

বেদসার
১৮০ টাকা

আহ্বান
৬০ টাকা

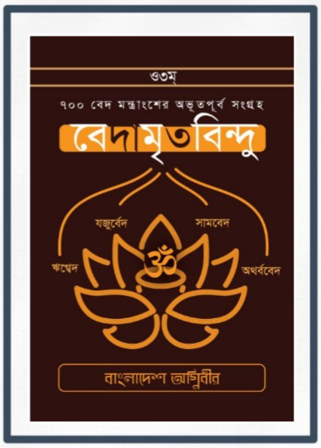

বেদামৃতবিন্দু
৯০ টাকা

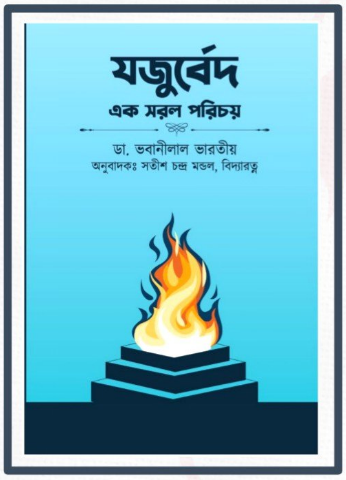

যজুর্বেদ এক সরল পরিচয়
১৬০ টাকা

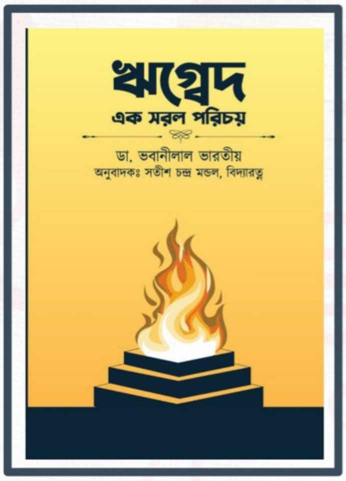

ঋগ্বেদ এক সরল পরিচয়
১৭০ টাকা

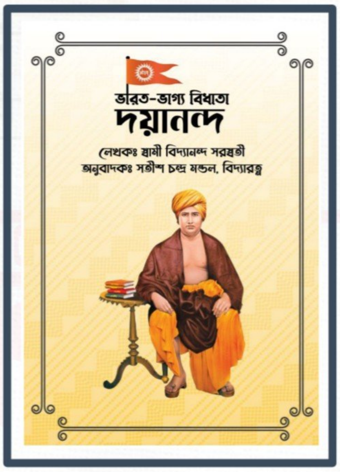

ভারত ভাগ্য বিধাতা দয়ানন্দ
১০০ টাকা

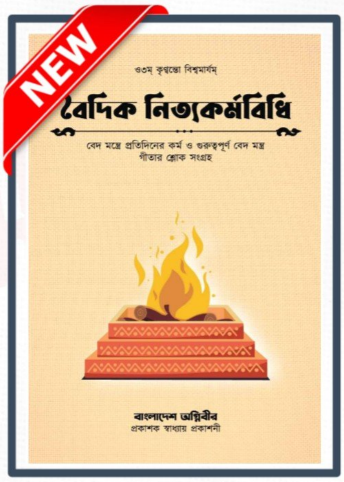

বৈদিক নিত্যকর্মবিধি
৫০ টাকা

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন

জনি আর্য 01822310609,

অরূপ কুমার 01673012197

দীপংকর সিংহ দীপ 01786659164 (হোয়াটসঅ্যাপ)